জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি

ষষ্ঠ শ্রেণী

রচনা
সুরাইয়া বেগম
ফিরোজা বেগম

সম্পাদনা
সিদ্দিকা কবীর

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ: ডিসেম্বর, ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
ফাইন ডট লি:

প্রচ্ছদ
সেলিম আহ্‌মেদ

চিত্রাঙ্কন
সামিনা নাফিজ

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণ :

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষা, আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল। উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালের নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক–শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার–বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়টি জীবনমুখী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তাই ষষ্ঠ শ্রেণীর 'গার্হস্থ্য অর্থনীতি' বইটিতে গৃহব্যবস্থাপনা, পরিবার ও সমাজ, খাদ্য ও পুষ্টি, পোশাক পরিচ্ছদের বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর তত্ত্বীয় জ্ঞান অপেক্ষা ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বয়স, পরিণমনের প্রতি লক্ষ রেখে ব্যবহারিক পাঠের পরিসর বাড়ানো হয়েছে। এই বই পড়ে শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজ শিখে কর্মোদ্যোগী, শ্রমে অভ্যস্ত ও স্বাবলম্বী হতে পারবে বলে আমরা আশা করছি।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যে–কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম–১০ম শ্রেণীর ৬০টি পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করে সময়মতো পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি–বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামাল উদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহ ব্যবস্থাপনা ও গৃহ পরিবেশ

গৃহ ও গৃহ পরিবেশ

আদিম মানুষ গৃহনির্মাণ করতে জানত না। বন্য জন্তু জানোয়ার বা ঝড় বৃষ্টির কবল থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য পাহাড়ের গুহায়, গাছের উঁচু শাখায়, পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিত। বেশিরভাগ সময় যাযাবর হয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত। ধীরে ধীরে মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখল। আগুন আবিষ্কার ও পশু পালন তাদের যাযাবর জীবনে প্রথম মাটির বন্ধন এনে দিল। ধীরে ধীরে তামা, লোহা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার শিখল। আস্তে আস্তে চাষাবাদও আয়ত্তে আনল। বন জঙ্গল সমতল করে বসতি স্থাপিত হল। এভাবে গৃহনির্মাণের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হল।

গৃহ

চার দেয়াল ঘেরা ঘরকে গৃহ বলা যায় না। গৃহ বলতে নির্দিষ্ট একটি বাড়িকে বোঝায় যেখানে পরিবারের বিভিন্ন সদস্য একত্রে বসবাস করে। মানুষের জীবনে গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনেক। প্রত্যেক সদস্যের বিভিন্ন চাহিদা গৃহে মেটানো হয়। যেমন খাদ্য, বস্ত্র, আরাম, বিনোদন, নিরাপত্তা, শখ ইত্যাদি। গৃহে মানুষের অভাব অভিযোগ মিটানো হয়। গৃহ তাদের আব্রু রক্ষা করে। গৃহ ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা বাড়ায়। বিয়ে ও পারিবারিক জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে। কাজ কর্ম উপলক্ষে বাইরে গেলেও কাজের শেষে ফিরে এসে বিশ্রাম নিতে হয় নিজ গৃহে।

পরিবারবদ্ধ হয়ে স্নেহ ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একত্রে বসবাস করার জন্য মানুষ গৃহের প্রয়োজন অনুভব করে। প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যও গৃহের দরকার। এছাড়া খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংরক্ষণের জন্য গৃহের প্রয়োজন।

গৃহ ব্যবস্থাপনা

একটি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ এবং আরামদায়ক গৃহ পরিবেশ সকল মানুষেরই কাম্য। কারণ এই পরিবেশেই পরিবারের সকল চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। গৃহ পরিবেশেই ব্যক্তির জীবনে ব্যবস্থাপনার আচরণের বিকাশ ঘটে।

গৃহ ব্যবস্থাপনাকে পরিবারের প্রশাসনিক দিক বলা হয়। গৃহের যা কিছু সম্পদ আছে তার সঠিক ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করাই হল গৃহ ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য। ব্যবস্থাপনার আচরণের বিকাশের জন্য গৃহ পরিবেশ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। গৃহ ব্যবস্থাপক তার জ্ঞান, দক্ষতা, দূরদৃষ্টি, বিচার ক্ষমতা অতীত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি দ্বারা গৃহকে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন এবং আরামদায়ক করতে পারেন।

গৃহ পরিবেশ

গৃহ ও গৃহ সংলগ্ন আশেপাশে যা আছে সব নিয়েই গৃহ পরিবেশ গড়ে ওঠে। পরিবারের সদস্যদের সুখ–শান্তি স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য নির্ভর করে সুষ্ঠু গৃহ পরিবেশের ওপর। গৃহই শিশুর জীবনের প্রথম পরিবেশ। এই পরিবেশে শিশু জন্মের পর বড় হতে থাকে। এই পরিবেশ যত সুন্দর, মার্জিত ও উন্নত হবে ততই শিশুর দেহ ও মন সুন্দর, মার্জিত ও উন্নত হতে সাহায্য করবে। অপরপক্ষে রুচিহীন বিশৃঙ্খল গৃহ পরিবেশে শিশু নিজের অজান্তে কতকগুলো বদভ্যাস অর্জন করে, যা তাকে ভালভাবে গড়ে উঠতে বাধা প্রদান করে। ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে গৃহ ও গৃহ পরিবেশের প্রভাব অনেক। সুন্দর সুশৃঙ্খল পরিবেশে গড়ে ওঠা শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে গোছানো হবে। বিভিন্ন কাজে যত্নবান হবে। তাদের সদভ্যাস গড়ে উঠবে। শিষ্টাচার শিখবে। উদার ও সুন্দর মনের অধিকারী হবে। শহরে বা গ্রামে, ছোট বড় যেমন গৃহই হোক,

সেখানে নির্দিষ্ট কতকগুলো ব্যবস্থা থাকবে। যেমন-রান্না, খাওয়া, গোসল, বিশ্রাম, লেখাপড়া, অতিথি আপ্যায়ন ও শখের কাজের সুবিধা। শহরের গৃহ অল্প পরিসর স্থানে হলেও আবাসিক এলাকার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকবে। যেমন-স্কুল, কলেজ, বাজার, মসজিদ, হাসপাতাল, খেলার মাঠ, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকতে হবে।

গ্রামের গৃহ উন্মুক্ত পরিবেশে গড়ে উঠলেও ভিতরে প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে। যেমন-পরিবারের সদস্যদের রান্না, খাওয়া, ঘুমানো, বিশ্রাম নেওয়া, লেখাপড়া করা, অতিথি আপ্যায়ন করা ইত্যাদি। উন্নত গৃহ পরিবেশ রক্ষার জন্য বাড়ির আশেপাশে ঝোপ জঙ্গল থাকবে না। ময়লা পানি, তরল আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য নর্দমা থাকবে। গোয়াল ঘর বাড়ি থেকে দূরে হবে। বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা থাকবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গৃহের অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, দেয়াল, মেঝে, দরজা, জানালার গ্রিল, সিলিং এবং কাচ

গৃহের পরিবেশকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলতে গৃহের ভিতরের ও বাইরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব অধিক। গৃহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর নির্ভর করে পরিবারের সদস্যদের আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুস্বাস্থ্য। গৃহ ও গৃহের পরিবেশ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রেখে মনে প্রশান্তির ভাব আনাই গৃহিণীর লক্ষ্য। গৃহের প্রতিটি জায়গায়, আনাচে কানাচে, সব আসবাবের নিচে ঝাড়ু দিতে হয়, মুছতে হয়, সঠিক পদ্ধতিতে যত্ন নিতে হয়। তবেই গৃহ পরিবেশ পরিষ্কার ও সুন্দর হয়। নতুবা অপরিচ্ছন্ন থাকলে রোগজীবাণু, পোকামাকড়ের জন্ম, মশা মাছির উপদ্রব হয়, স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, কাজকর্মের অসুবিধা হয়।

গৃহের অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অনেক সময় ও শক্তির বিনিময়ে এই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হয়। একদিনে হঠাৎ করে এই পরিষ্কারের কাজগুলো করা সম্ভব নয়। কাজগুলো হল ঘরের মেঝে ঝাড়ু দেওয়া ও মোছা। ঘরের দেয়াল, দরজা, জানালার গ্রিল, কাচ ও সিলিং পরিষ্কার করা, গৃহের সকল কাপড়চোপড়, বাথরুম, সিঙ্ক, বেসিন, টয়লেট পরিষ্কার করা, আসবাবপত্র ঝাড়া মোছা ইত্যাদি। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই পরিচ্ছন্নতার কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে গুছিয়ে করার চেষ্টা করতে হবে।

প্রত্যেক গৃহে প্রতিদিন ধোয়া মোছার কাজ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব ময়লা পরিষ্কার হয় না। দেখা যায় বাড়তি কাপড়চোপড়, থালাবাটি, আসবাবপত্র অপরিষ্কার হয়ে থাকে। গৃহস্থালির সার্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজগুলো দৈনিক, সাপ্তাহিক ও বাৎসরিক এভাবে পরিকল্পনা করে নিতে হয়।

১. দৈনিক পরিচ্ছন্নতা

গৃহ পরিষ্কার করার কাজগুলো হল প্রত্যহ ঘর, বারান্দা ঝাড়ু দেওয়া ও মোছা, আসবাবপত্রের উপরিভাগ মোছা, বিছানা গোছানো, বইয়ের টেবিল পরিষ্কার করা, রান্নাঘর ও অন্যান্য ঘরের দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র পরিষ্কার করা ও গুছিয়ে রাখা, ময়লা আবর্জনা সরানো ইত্যাদি। কলতলা, বেসিন, বাথরুম, পায়খানা প্রতিদিনই পরিষ্কার করতে হয়।

২. সাপ্তাহিক পরিচ্ছন্নতা

ঘরের ঝুল ঝাড়া, দরজা, জানালার গ্রিল ও কাচ ঝাড়া মোছা, বিছানার চাদর ধোয়া, রান্নাঘরের মেঝে ভালো করে ধোয়া, রান্নাঘরের তাক পরিষ্কার করা, মাঝে মাঝে কার্পেট রোদে দেওয়া ও ঝাড়া ইত্যাদি সাপ্তাহিক পরিচ্ছন্নতার অন্তর্ভুক্ত।

৩. বাৎসরিক পরিচ্ছন্নতা

ফাটা দেওয়াল মেরামত করা, বাড়িতে চুনকাম করা, আসবাবপত্র রং করা, বড় বড় আসবাবপত্র স্থানান্তর করে মেঝে পরিষ্কার করা, আলমারিতে তোলা কাপড়, লেপ-তোশক, কম্বল রোদে দেওয়া, কাচের বা কাঠের আলমারি, ট্রাংক বা বাক্সে তোলা কাচের কাপ প্লেট ইত্যাদি ধোয়া ও মোছা ইত্যাদি বাৎসরিক পরিচ্ছন্নতার অন্তর্ভুক্ত।

এসব কাজের দায়িত্ব পরিবারের সদস্যদের বয়স, শক্তি ও দক্ষতা অনুসারে ভাগ করে দিতে হবে। এতে গৃহের পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ছোটদের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান ও শৃঙ্খলাবোধ গড়ে ওঠে এবং তারা শ্রমমুখী হয়।

গৃহ পরিষ্কার করার সামগ্রী

১. ফুল ও শলার ঝাড়ু, ব্রাশ ও মপিং ব্রাশ, ২. ঘর মোছার কাপড় ৩. বালতি, গামলা, মগ, ময়লার ঝুড়ি ৪. পানি, ফিনাইল, গুঁড়া সাবান।

ঘরের মেঝে, বারান্দা ইত্যাদির ধূলোবালি পরিষ্কার করার জন্য ফুল বা শলার ঝাড়ুর প্রয়োজন। ঘরের মেঝে মোছার জন্য নরম সুতি অথচ সহজে পানি শোষণ করে এরূপ কাপড় নিতে হবে। পরিষ্কার পানি দিয়ে প্রতিদিন মেঝে মুছে ফেলতে হবে। মোজাইকের মেঝে হলে রোজ মোছা ছাড়াও সপ্তাহে বা মাসে একবার পানিতে গুঁড়া সাবান দিয়ে ব্রাশের সাহায্যে ঘষে কাপড় দিয়ে ভাল করে মুছতে হবে। এভাবে মুছলে মেঝের সব দাগ উঠে পরিষ্কার হয়ে যাবে। রান্নাঘরের মেঝে পরিষ্কার করার জন্য পৃথক কাপড় ব্যবহার করতে হয়। সপ্তাহে একবার রান্নাঘরের মেঝে গরম পানিতে গুঁড়া সাবান বা সোডা দিয়ে ব্রাশের সাহায্যে পরিষ্কার করতে হবে। মাটির মেঝে হলে কয়েকদিন অন্তর নিয়মিত লেপতে হবে এবং শুকনো রাখতে হবে।

ঘরের মেঝে মোছা ও ধোয়ার জন্য বালতি বা গামলা ও মগের প্রয়োজন। এই বালতি, গামলা, মগ, প্লাস্টিক, অ্যালুমিনিয়াম, টিন ও অন্যান্য ধাতুর হয়ে থাকে। গ্রামে সাধারণত মাটির গামলা ব্যবহার করা হয়। প্লাস্টিকের তৈরি বালতি ও মগ ব্যবহার করলে মেঝের ক্ষতি হয় না। শহরে মপিং ব্রাশের সাহায্যে দাঁড়িয়েও ঘর মোছা যায়। রান্নাঘরের কলতলা, গোসলখানা ইত্যাদি পিচ্ছিল স্থানগুলো শলার ঝাড়ু বা ব্রাশ দিয়ে ভিমের সাহায্যে ঘষে পরিষ্কার করতে হয়। শ্যাওলা পড়া ও পিচ্ছিল জায়গায় ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দিলে ভালো পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত হয়। ঘরের সিলিং ও দেয়াল পরিষ্কার করার জন্য লম্বা বাঁশের মাথায় ফুলঝাড়ু বেঁধে ঝুলঝাড়ু হিসেবে ব্যবহার করা যায়।



গৃহ পরিষ্কারের সরঞ্জাম

আসবাবপত্রের উপরিভাগ, খাবার টেবিল, রান্নাঘরের তাক, দরজা, জানালার গ্রিল, কাচ ইত্যাদি পরিষ্কার করার জন্য আলাদা আলাদা ঝাড়ন রাখতে হবে। নরম সুতি কাপড় অথবা গেঞ্জির কাপড়কে ঝাড়ন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। মোছার ঝাড়ন পরিষ্কার রাখার জন্য প্রায়ই গরম পানিতে সাবান, সোডা দিয়ে সিদ্ধ করে ধুতে হবে।

জানালা দরজার কাঠে বার্নিশ করা থাকলে ঝাড়ন দিয়ে মুছতে হবে। তবে কাঠের ওপর পেইন্ট করা থাকলে জানালা দরজা মাঝে মাঝে ভিজা কাপড়ে সাবান দিয়ে ভালো করে ঘষলে দাগ উঠে যায়। জানালার গ্রিলে, বিশেষ করে রান্নাঘরের জানালার গ্রিলে বেশি ময়লা জমে এবং দাগ পড়ে। তবে গরম পানিতে গুঁড়া সাবান গুলে দাঁতের ব্রাশ দিয়ে ভাল করে ঘষে ভিজা কাপড় বা স্পঞ্জ দিয়ে মুছে ফেললে সব ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে। মাসে অন্তত একবার এভাবে গ্রিল পরিষ্কার করা উচিত।



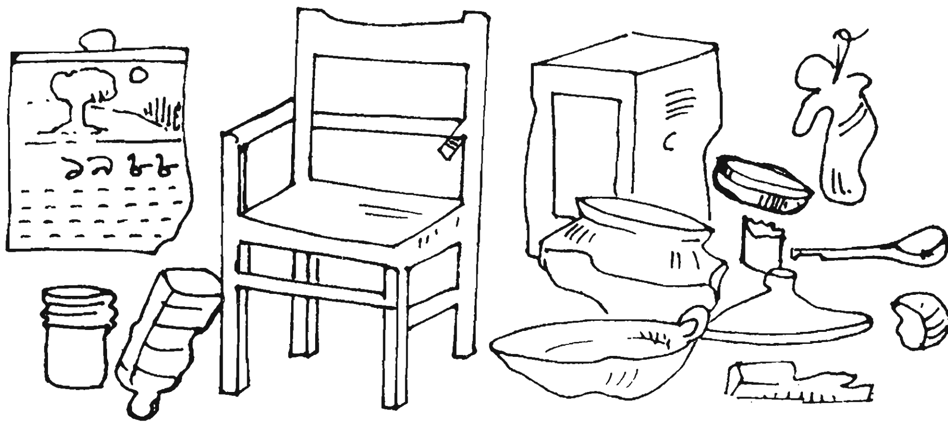
ঝুলঝাড়ু ও মপিং ব্রাশ দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘর মোছা

কাচের দরজা জানালা পরিষ্কার করতে হলে প্রত্যহ পাতলা সুতির কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে ধূলো ঝেড়ে ফেলতে হবে। বেশি ময়লা হলে বা দাগ পড়লে প্রথমে নরম কাপড় বা খবরের কাগজ ভিজিয়ে কাচ ভালো করে ঘষে তারপর শুকনো নরম কাপড় দিয়ে মুছতে হবে। রান্নাঘরের জানালার কাচে তেল কালি লেগে যায়। এরূপ কাচ পরিষ্কার করতে হলে পানিতে কয়েক ফোঁটা অ্যামোনিয়া বা গুঁড়া সাবান দিয়ে ভালো করে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।

বাতিলকৃত অপ্রয়োজনীয় জিনিস অপসারণ

গৃহের বিভিন্ন জিনিসপত্র বহুদিন ব্যবহারের ফলে পুরানো হয়ে যায়, দাগ পড়ে যায়, কোথাও ভেঙে যায়, চটা উঠে যায়, আঁকাবাঁকা হয়ে যায়, ফলে তেমন কোনো কাজে আসে না। মেলা থেকে কেনা ঝুলিয়ে রাখা খেলনা, দেয়ালে টাঙানো পুরানো ছেঁড়া ছবি, ক্যালেন্ডার ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট করে।

পুরানো অকেজো জিনিস অযথা ঘরের কোণা, তাক, ড্রয়ার, আলমারি দখল করে রাখে। সেসব জায়গা এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস পরিষ্কার করতে সময় ও শক্তি উভয়ই নষ্ট হয়। অথচ এসব জিনিস রাখতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রাখার জায়গাই থাকে না। বেশিদিন অব্যবহৃত অবস্থায় জিনিসপত্র পড়ে থাকলে তেলাপোকার আস্তানা গড়ে ওঠে। খালি টিন কিছুদিন ঘরে পড়ে থাকলে মরিচা পড়ে যায়। পুরানো নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিসপত্র,



বাতিলকৃত জিনিস

বালতি, হাঁড়িপাতিল ও অন্যান্য ভাঙা আসবাবপত্র বাতিল করে ঘর থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত। যেখানে সেখানে অপ্রয়োজনীয় বাতিলকৃত জিনিস পড়ে থাকলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য গৃহের বাতিলকৃত জিনিস কাউকে দিয়ে দিতে হবে অথবা বিক্রি করে ফেলতে হবে নতুবা ডাস্টবিনে বা ময়লা ফেলার স্থানে ফেলে দিতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

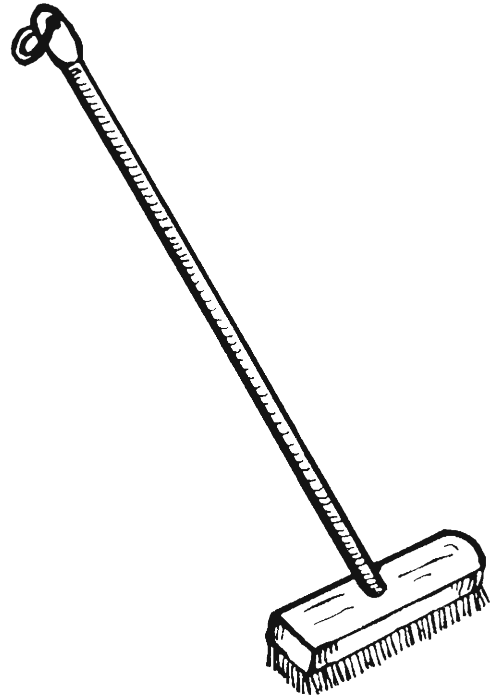
গৃহের বহিরাঙ্গানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নর্দমা, ঝোপঝাড়, বাগান, নালা নিষ্কাশন

মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য গৃহের ভিতর এবং বাহির উভয়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন। নর্দমা ও নালা নিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহের কাছে ব্যবহৃত ময়লা পানি, তরল বর্জ্য, বৃষ্টির পানি এবং পায়খানার পানি অপসারিত হয়। অপরিচ্ছন্ন থাকলে এসব স্থানে মশা মাছি ডিম পাড়ে, বংশ বিস্তার করে রোগজীবাণু ছড়ায়। এ ধরনের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানুষ ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় ইত্যাদি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। এ কারণে গৃহের বহিরাঙ্গানের বাগান, ঝোপঝাড়, নর্দমা পরিষ্কার রাখা ও নালা নিষ্কাশনের পথ সচল রাখা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অতি জরুরি।

নর্দমা পরিষ্কার করা

গৃহের বাইরে গৃহ সংলগ্ন ভূপৃষ্ঠে নর্দমা রাখার উদ্দেশ্য গৃহের যাবতীয় কাজের ময়লা পানি, বৃষ্টির পানি বের করে দেওয়া। শহরে নর্দমার সাথে ভূগর্ভস্থ পানির পাইপ লাইনের সংযোগ থাকে। নর্দমার উপরিভাগ খোলা থাকে বলে নানা আবর্জনা, পলিথিনের ব্যাগ, বিস্কুটের প্যাকেট ইত্যাদি পড়ে পানি চলাচলের পথ আটকে যেতে পারে। নর্দমায় পানি ও শ্যাওলা জমে আবর্জনা পচা দুর্গন্ধ বের হয়। এতে পরিবেশ দূষিত হয়।

জমে থাকা পানিতে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পরিবেশ মশা মাছির বংশ বিস্তারে সাহায্য করে। লম্বা হাতলওয়ালা ব্রাশের সাহায্যে প্রতিদিন নর্দমা পরিষ্কার করতে হবে। শলার ঝাড়ু দিয়েও পরিষ্কার করা যায়। নর্দমায় মাঝে মাঝে ফিনাইল ও ডিডিটি পাউডার ছিটিয়ে দিতে হবে।



নর্দমা পরিষ্কারের লম্বা হাতলওয়ালা ব্রাশ

গ্রামের বাড়িতে এই নর্দমা কাঁচা হয়ে থাকে। কাঁচা নর্দমা তৈরি করতে হলে নর্দমার পাড় যাতে ধসে না পড়ে তার জন্য শক্ত মাটি দিয়ে পাড় করতে হবে। এই কাঁচা নর্দমায় বর্ষার পানি জমে গেলে মশা মাছির উপদ্রব বাড়ে। তাই নর্দমা মাঝে মাঝে কোদাল দিয়ে গভীর করতে হবে এবং পরিষ্কার রাখতে হবে।

ঝোপঝাড়

বাড়ির চারপাশে অযথা ঝোপঝাড় হতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ এই ঝোপঝাড় মশা মাছি, বিষাক্ত পোকামাকড় ও সাপের আশ্রয়স্থল। তাছাড়া ঝোপঝাড় গৃহের বাইরে বাতাস চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়, গৃহে রোদ প্রবেশে বাধা দেয়। রোদের অভাবে মাটি স্যাঁতসেঁতে থাকে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। বাইরের ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে সামনের অংশে ফুল ও পিছনের অংশে শাক ও সবজির চাষ করা যায়। এতে গৃহের সৌন্দর্য বাড়ে, মন প্রফুল্ল থাকে। টাটকা শাকসবজি খাওয়ার আনন্দও পাওয়া যায়।

বাগান

গৃহের বাইরে খালি জায়গায় মৌসুমি ফুল, ফল ও শাকসবজির বাগান গৃহের সৌন্দর্য বাড়ায়। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বাগানের উপযুক্ত পরিচর্যার প্রয়োজন।

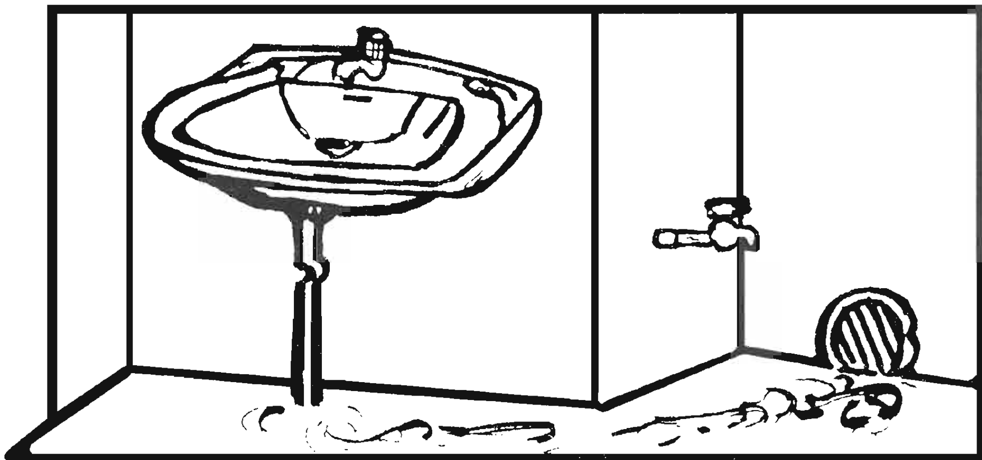


একটি গৃহের সামনে ফুল ও পিছনে ফলের বাগান

পরিচর্যার অভাবে বাগানে আগাছা জন্মে জঙ্গালে পরিণত হয়। গাছের বর্ধন ও ফলন কম হয়। নিয়মিত গাছের গোড়া কুপিয়ে মাটি নরম করে আগাছা পরিষ্কার করা দরকার। এই কাজের ভার পরিবারের ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে। এতে ছোটবেলা থেকে কাজের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায়, মর্যাদাবোধ জাগে। বাগানে কাজ করার ফলে দেহ ও মন সুস্থ থাকে। পরিশ্রমের কাজে অভ্যস্ত হয়।

নালা নিষ্কাশন

প্রত্যেক গৃহের ব্যবহৃত ময়লা পানি বের হয়ে যাওয়ার জন্য ও মলমূত্রাদি নিষ্কাশনের জন্য নালা বা পাইপ থাকে। এই পাইপ দিয়ে তরল ময়লা রাস্তার নিচে ভূগর্ভস্থ মোটা পাইপে গিয়ে পড়ে। সেখান থেকে সব আবর্জনা বড় পাইপের মাধ্যমে নদীতে গিয়ে পড়ে। এই পাইপের জায়গায় জায়গায় কিছু মুখ ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত খোলা থাকে। এই মুখগুলো লোহা



কলের নিচে ও বেসিনের নিচে নালির মুখে জালিযুক্ত ঢাকনা

কিংবা সিমেন্টের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। এরকম দুই একটা ঢাকনা গৃহের সীমানার মধ্যেও থাকে। কখনও পাইপে কোনো ময়লা পড়ে আটকে গেলে ঢাকনা তুলে লম্বা মজবুত বাঁশের চটা বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে ধাক্কা দিলে ময়লা সরে যাবে।

তরল ময়লা আবর্জনা ফেলার পাইপে কখনও কোনো তরিতরকারির খোসা বা অন্য কোনো শুষ্ক আবর্জনা ফেলতে নেই। তাহলে পাইপের মুখ বন্ধ হয়ে পানি ও মল নিঃসরণে অসুবিধা হবে। পাইপ বন্ধ হয়ে গেলে পায়খানার সব ময়লা পাইপ দিয়ে যেতে পারবে না। সেগুলো পায়খানার প্যান উপচিয়ে বাথরুমে চলে আসবে। রান্নাঘরের ব্যবহৃত সমস্ত ময়লা পানি পাইপ দিয়ে রান্নাঘরে চলে আসবে। ফলে ঘরের পরিবেশ দূষিত হবে। তাই রান্নাঘর এবং গোসলখানার পাইপের মুখে জালি দেওয়া হয়। তাহলে পানি ছাড়া অন্য কোনো ময়লা নলের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গৃহ পরিবেশ রক্ষায় ব্যবহারভেদে প্রয়োজনীয় জিনিস যথাস্থানে সংরক্ষণ

বাড়ি ঘরের সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রথম এবং প্রধান উপায় সংসারের প্রতিটি জিনিস গুছিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেওয়া। তাহলে জিনিসগুলো কাজের সময় হাতের কাছে পাওয়া যাবে। অযথা সময় ও শক্তি খরচ হবে না। আবার কাজ শেষ হয়ে গেলে যেখানে সেখানে না ফেলে রেখে যথাস্থানে জিনিসগুলো রেখে দিতে হবে। এই অভ্যাস পরিবারের সদস্যদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। যত্রতত্র জিনিসপত্র ছিটিয়ে রাখলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। কাজের সময় সঠিক জিনিস পাওয়া না গেলে অযথা জিনিস খুঁজতে গিয়ে হয়রান হতে হয়। সময় নষ্ট হয়, তাতে কাজের প্রতি বিরক্তি আসে। সুন্দর গোছানো ঘরে কাজে উৎসাহ আসে। গৃহের কাজে সাধারণত যেসব সাজসরঞ্জাম ও উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় :

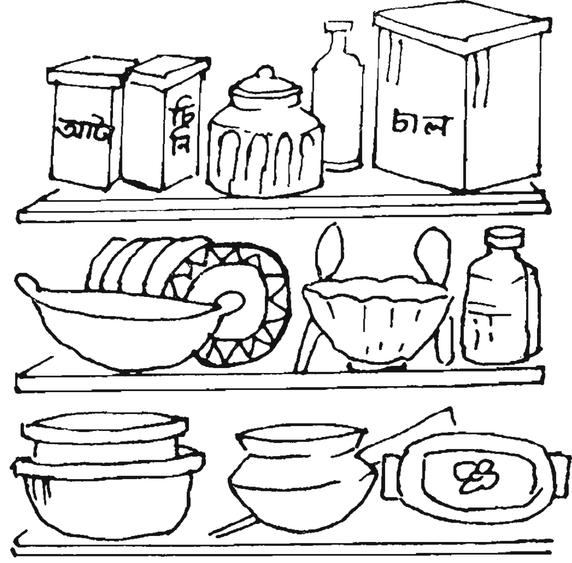
১. গৃহস্থালির সাজসরঞ্জাম
২. প্রসাধন সামগ্রী
৩. সেলাইয়ের সরঞ্জাম
৪. বাগান করার সরঞ্জাম
৫. প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ ও সরঞ্জাম

১. গৃহস্থালির সাজসরঞ্জাম

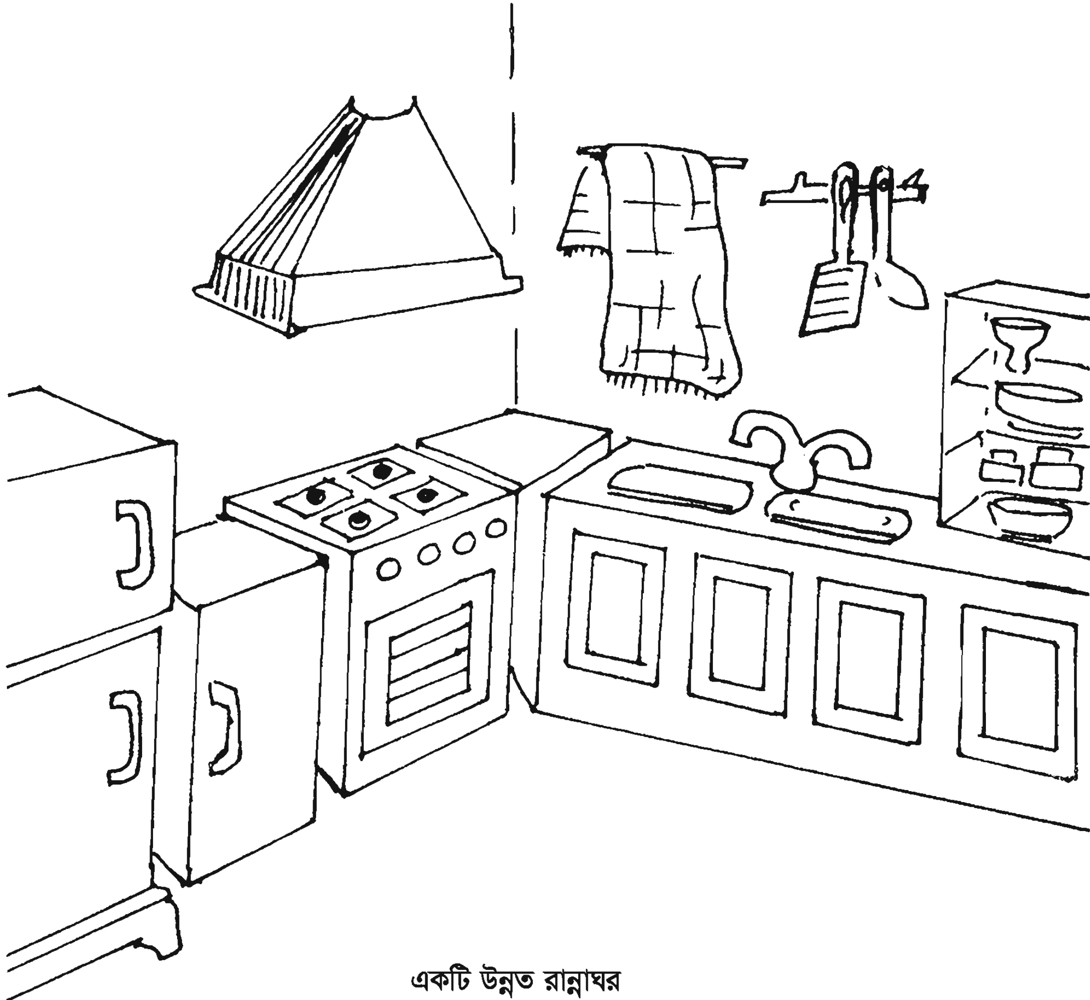
গৃহস্থালির সাজসরঞ্জাম বলতে গৃহকর্মে ব্যবহৃত আসবাবপত্র, তৈজসপত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিকে বুঝায়। প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের আরাম আয়েস, সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করার জন্য উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম দরকার। এই সরঞ্জামগুলো দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন হতে পারে, আবার কিছু কিছু ভবিষ্যতে দরকার পড়তে পারে, সুতরাং এগুলোর উপযুক্ত সংরক্ষণের ফলে স্থায়িত্ব বাড়ে ও চাকচিক্য ঠিক থাকে। গৃহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নির্ভর করে ভালোভাবে জিনিসপত্র রাখা ও তার যথাযথ বিন্যাসের ওপর, এর ফলে জিনিসপত্র প্রয়োজনে নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়। ঠিকমতো গুছিয়ে রাখতে পারলে কাজের সময় খোঁজাখুঁজি করে অনর্থক সময় ও শক্তির অপচয় হয় না।

বিভিন্ন পরিবারের আসবাবপত্র বিভিন্ন ধরনের এবং ছোট বড় হয়ে থাকে। এগুলো কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ঘরে সাজিয়ে রাখতে হয়। যেমন—শোবার ঘরে খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলনা, আলমারি ইত্যাদি সুবিধামতো জায়গায় রাখতে হয়, যেন আলো–বাতাস প্রবেশে ও যাতায়াতে অসুবিধা না হয়। এরূপ অন্যান্য ঘরের আসবাবপত্রও প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক জায়গায় গুছিয়ে রাখতে হবে। এমন কতকগুলো জিনিস আছে যা প্রত্যেক পরিবারে দৈনন্দিন কাজে ঘন ঘন ব্যবহৃত হয়। এ সমস্ত জিনিসপত্র রাখার জন্য তাক ব্যবহার করা যেতে পারে।

রান্নাঘরের জিনিসপত্র সঠিক স্থানে গুছিয়ে রাখলে যে কোনো কাজ করতে গেলে কাজের সুবিধা হয়। ঘরের ব্যবহৃত ছোট বড় খালি কৌটা ও বয়ামগুলো ভালো করে ধুয়ে মুছে মসলা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য রেখে, কৌটার গায়ে লেবেল লাগিয়ে তাকে সাজিয়ে রাখতে হবে। যেমন—আটা, ময়দা চিনি, ডাল ইত্যাদি। টিনের গায়ে লেখা থাকলে অযথা সবগুলো টিন খুলে দেখতে হয় না। বাজারে প্লাস্টিক বা লোহার সেলফ, কাপ, পিরিচ রাখার স্ট্যান্ড পাওয়া যায়, তাতে প্লেট, কাপ সাজিয়ে রাখা যায়। এগুলো তাকেও রাখা যায়। বড় বড় ডেকচি, সসপ্যান যা সবসময় দরকার হয় না তা মেজে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে রান্নাঘরের উপরের তাকে রাখা যায়। দৈনন্দিন ব্যবহারের হাঁড়ি, কড়াই ইত্যাদি নিচের তাকে রাখা যায়। ধারাল সরঞ্জাম দা, বঁটি, ছুরি একধারে একটা তাকে রাখতে হবে। কাজের অতিরিক্ত দা, বঁটি, ছুরি পুরানো কাপড়ে পেঁচিয়ে রান্নাঘরের ওপরের তাকে রাখা যায়। তাক না থাকলে কোনো বাক্সে



রান্নাঘরের সরঞ্জামাদি সাজিয়ে রাখা


একটি উন্নত রান্নাঘর

রাখতে হয়। তা না হলে মরিচা বা জং পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

আজকাল উন্নত রান্নাঘরে সব কাজ দাঁড়িয়ে করার ব্যবস্থা থাকে। রান্নাঘরের সরঞ্জাম সংরক্ষণের জন্য নানা আকারের কেবিনেট, ড্রয়ার থাকে। রান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম ড্রয়ারে ও কেবিনেটে কাজের সুবিধামতো সাজিয়ে রাখা যায়।

২. প্রসাধন সামগ্রী

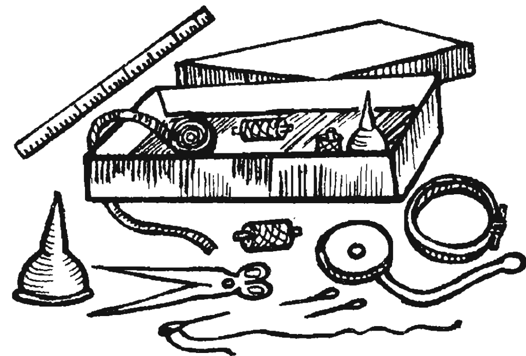
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য, সাজগোজ করার জন্য যেসব দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করা হয় সেসবই প্রসাধন সামগ্রী। শিশু, ছেলেমেয়ে, মহিলা পুরুষ সবাই প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করে। বয়স, স্ত্রী–পুরুষ এবং ঋতুভেদে প্রসাধন সামগ্রী ভিন্ন ভিন্ন হয়। গায়ে মাখা সাবান, শ্যাম্পু, চুলের তেল, চিরুনি, ফিতা, ক্লিপ, কাঁটা, হেয়ার ব্যান্ড; শেভিং ব্রাশ, ক্রিম, রেজার, ব্লেড ইত্যাদি দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী। এসব সামগ্রী ব্যবহারের কাছাকাছি জায়গায় তাকে, শেলফে বা বাক্সে গুছিয়ে রাখা সুবিধাজনক। আনন্দ উৎসবে যোগ দেওয়া ও বাড়ির বাইরে বেড়াতে যাওয়ার জন্য যেসব প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করা হয় সেসব হল স্নো, পাউডার, কোল্ড ক্রিম, গায়ে মাখার লোশন, লিপস্টিক, আইব্রু পেন্সিল, পারফিউম, আতর ইত্যাদি। সাজার জিনিসপত্র ড্রেসিং টেবিলের ওপরে বা ড্রয়ারে বা ড্রেসিং টেবিলের কেবিনেটে রাখতে হবে। নতুবা আয়নার কাছে তাকে বা টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখা যায়। অনেকেই সাজার প্রসাধন সামগ্রী চেন লাগানো ছোট ব্যাগে অথবা বিউটি বক্সে রাখে। প্রসাধন সামগ্রী যেন ছোট শিশুর নাগালের মধ্যে না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।



বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রীসহ ড্রেসিং টেবিল

৩. সেলাইয়ের সরঞ্জাম

গৃহে পোশাক পরিচ্ছদ তৈরি ও মেরামতের জন্য যেসব সরঞ্জামের প্রয়োজন সেগুলো সুচ, সুতা, কাঁচি, গজফিতা, স্কেল, ফ্রেম, আঙুলের টোপর, দাগ দেওয়ার রঙিন চক, বোতাম ইত্যাদি। এছাড়া সেলাই মেশিনও অনেক গৃহে থাকে। ছোট ছোট সরঞ্জাম রাখার জন্য কাঠের বা বেতের ছোট বাক্স, ছোট বিস্কুটের টিন, চকোলেট বা লজেন্সের বাক্স ব্যবহার করা যায়। সব সরঞ্জাম বাক্সে গুছিয়ে রাখলে প্রয়োজনে হাতের কাছে পাওয়া যাবে। ছোট শিশুদের নাগালের বাইরে, সেলাই মেশিনের কাছাকাছি সেলাইয়ের সরঞ্জামের বাক্স রাখতে হবে যেন পরিবারের অন্যান্য সদস্য প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে।



সেলাইয়ের সাজসরঞ্জামসহ বাক্স

৪. বাগান করার সরঞ্জাম

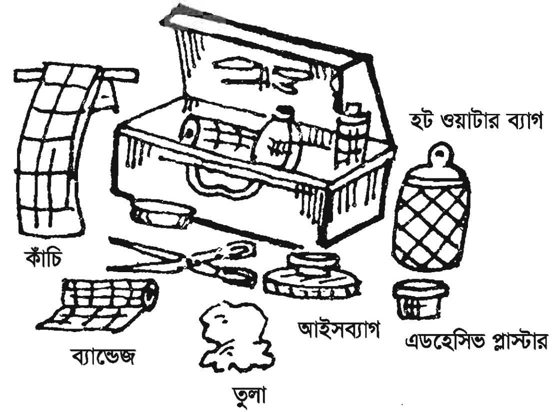
বাড়ির আঙিনায় ফুল, ফল বা সবজি বাগান দেহ ও মনে আনন্দের খোরাক যোগায়। বাগানের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য নিয়মিত পরিচর্যার প্রয়োজন। আগাছা বাছা, পানি দেওয়া, নিড়ানো, জঞ্জাল কাটা ইত্যাদি কাজের জন্য উপযুক্ত

সরঞ্জামের প্রয়োজন। বাগান করার সরঞ্জাম কোদাল, শাবল, দা, নিড়ানি, খুরপি, কাঁচি, ঝাঁঝরি, গাছে পানি দেওয়ার প্লাস্টিকের পাইপ, ওষুধ ছিটাবার স্প্রেয়ার, আবর্জনা ফেলার টুকরি ইত্যাদি। এ সরঞ্জামগুলো যত্ন সহকারে না রাখলে ভেঙে যায়, মরিচা পড়ে, চুরি হয়ে যায়। সাধারণত বাগানের কাছাকাছি জায়গায় রাখলে সহজে পাওয়া যায়। বাড়িতে সিঁড়ির নিচে ছোট ঘর বা জায়গা থাকলে তারের ফ্রেম দিয়ে দরজা করে সেখানে রাখা যায়। গ্যারেজে অতিরিক্ত জায়গা থাকলে সেখানে তাক বানিয়ে বাগানের সরঞ্জামগুলো রাখলে সহজে পাওয়া যায়। বাইরে কোনো জায়গা না থাকলে ঘরে স্টোর রুমে জায়গা ভাগ করে নিয়ে সরঞ্জামগুলো রাখা যায়। সরঞ্জামগুলো তুলে রাখার আগে মাটিকাদা পরিষ্কার করে পানি শুকিয়ে রাখলে সহজে মরিচা পড়ে না এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৫. প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ ও সরঞ্জাম

ছোট বড় কোনো দুর্ঘটনায় আহতদের তাৎক্ষণিকভাবে যে চিকিৎসা দেওয়া হয় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে।

প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রত্যেক গৃহেই রাখা উচিত কারণ এগুলোর প্রয়োজন যে কোন সময় হতে পারে। দুর্ঘটনা কখনও বলে কয়ে আসে না অথচ পরিস্থিতি মোকাবিলার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন। প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ বার্নল, তুলা, ব্যান্ডেজ, পাতলা পরিষ্কার কাপড়, এডহেসিভ প্লাস্টার, ফার্স্ট এইড ব্যান্ডেজ, স্পিরিট, কাঁচি, সেফটিপিন, গরম ও বরফ পানির ব্যাগ, অ্যান্টিসেপটিক পাউডার বা মলম, ডেটল, ব্যথা কমার ওষুধ ইত্যাদি।



প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ ও সরঞ্জাম

প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণগুলো '+' চিহ্নিত যে বাক্সে সংরক্ষণ করা হয় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স (FIRST AID BOX) বলে। ওষুধপত্রের শিশির গায়ে নাম লিখে রাখতে হবে। নাম লেখা না থাকলে তাড়াতাড়ি ভুল ওষুধ ব্যবহারে অনেক বিপদ ঘটে থাকে। প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স ছোট ছেলেমেয়েদের হাতের নাগালের বাইরে রাখতে হবে। এই বাক্স উঁচু একটা তাকে বা উঁচু দেয়ালের আলমারিতে চোখের সামনে রাখতে হবে। তবে যেখানেই রাখা হোক না কেন তা যেন বাড়ির সকল সদস্য জানেন এবং প্রয়োজনে যে কেউ ব্যবহার করতে পারেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পারিবারিক সবজি বাগান ও ফল বাগান

সবজি চাষের পদ্ধতি

সবজি বাগান হচ্ছে, যে বাগানে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির চাষ করা হয়। কোনো পরিবারকে কেন্দ্র করে বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় যে সবজি বাগান করা হয় তাকে পারিবারিক সবজি বাগান বলে। সাধারণত বসতবাড়ির চারপাশে যে সামান্য জায়গা থাকে সেখানে এলোমেলো করে বিভিন্ন জাতের শাকসবজি লাগানো হয়। এ ধরনের সবজি উৎপাদনে কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন কম হয়, অন্যদিকে শাকসবজির পুষ্টিমান আশানুরূপ হয় না। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য, কীভাবে একই জমি থেকে বছরে একাধিক ফলন পাওয়া যায় সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে। অর্থাৎ সবজি চাষের নিবিড়তা বাড়াতে

হবে। একই জমিতে সারা বছর বিভিন্ন প্রকার সবজি চাষের পদ্ধতিকে নিবিড় সবজি চাষ পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে বছরের কোনো সময়ই জমি খালি থাকে না। এজন্য বসতবাড়িতে সবজি চাষের একটি মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে। নিবিড় সবজি চাষের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে।
যেমন—১. পর্যায়ক্রমিক চাষ, ২. মিশ্র ফসল, ৩. রিলে ফসল, ৪. ফালি ফসল ও ৫. সারি ফসল পদ্ধতি।

পর্যায়ক্রমিক চাষ

এই পদ্ধতিতে সারা বছর একটি জমিতে সবজি চাষ করা হয়। একটি সবজি সংগ্রহের সাথে সাথে অন্য একটি সবজি ঐ জমিতে লাগানো হয়।

মিশ্র ফসল পদ্ধতি

কয়েক ধরনের সবজি বীজ একই সময়ে একই জমিতে ছিটিয়ে লাগানো হয়। যেমন—ঢেঁড়সের সাথে ডাঁটা ও মরিচের চাষ করা।

রিলে ফসল পদ্ধতি

একটি সবজি পরিপক্বতার সময় হলে অন্য একটি সবজির বীজ বপন করা বা চারা লাগানো। যেমন—কাকরল গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেশি শিমের বীজ বপন করা।

ফালি ফসল পদ্ধতি

একটি জমিকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করা এবং বিভিন্ন খণ্ডে একই সময়ে কয়েক ধরনের সবজি চাষ করা। সাধারণত পারিবারিক সবজি বাগানে এভাবে চাষ করা হয়।

সারি ফসল পদ্ধতি

একটি সবজির দুই সারির মধ্যে খালি জায়গায় অন্য সবজি চাষ করা। যেমন—আলু গাছের সারির ফাঁকে লালশাক, ধনেপাতা, পালংশাকের চাষ করা।

সবজি চাষের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

নিবিড় সবজি চাষের উদ্দেশ্যগুলো হল–

১. সীমিত পরিমাণে জমি থেকে সারা বছর বিভিন্ন সবজি উৎপাদন করা।
২. উৎপাদিত সবজি পরিবারের সদস্যদের খাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
৩. পুষ্টিহীনতা দূর করা।
৪. পরিবারের মহিলা ও ছেলেমেয়েদের সবজি উৎপাদনে সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহী করা।
৫. অতিরিক্ত সবজি বাজারজাত করে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করা।
৬. পারিবারিক সহযোগিতা ও আন্তরিকতার ক্ষেত্র প্রশস্ত করা।
৭. ফসল ফলানোর জন্য মাটির গুণাগুণ বজায় রাখা।
৮. অবসর বিনোদন ও শখ মিটানো।

নিবিড় সবজি চাষের জমির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ঠ্যগুলো হল॥

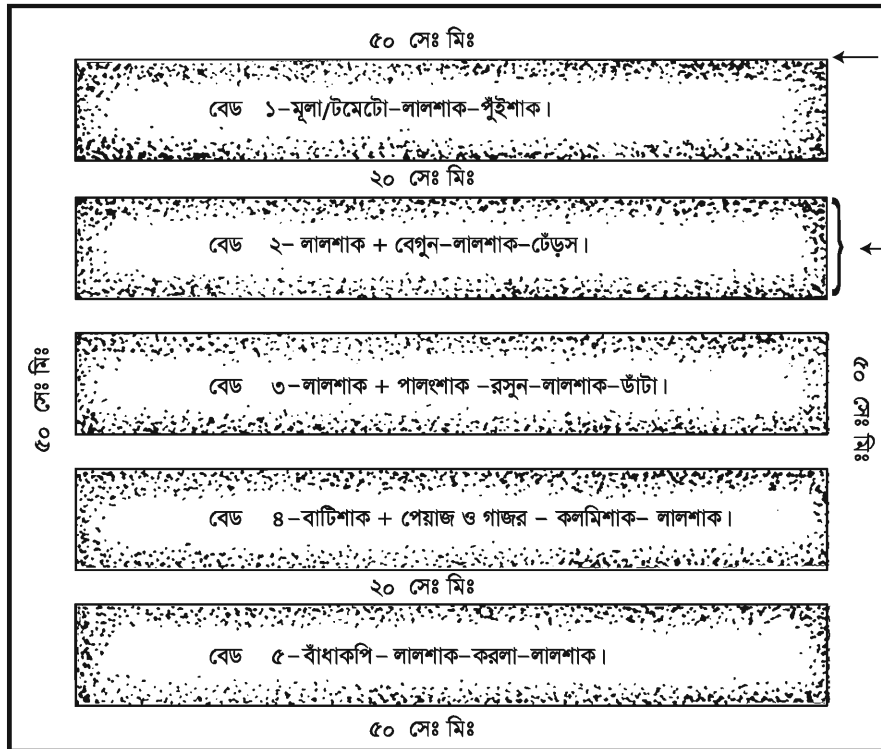
১. বাগানের জমি সমতল হবে।
২. জায়গার পরিমাণ হবে ৬ মিটার x ৬ মিটার বা ৩৬ বর্গমিটার।
৩. জমিতে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকবে।
৪. জমিতে যেন পানি না জমে।
৫. জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৬. বাগানের চারদিকে বেড়া দিতে হবে।

সবজি বাগানের নকশা ও সবজি বিন্যাস

সাধারণত পারিবারিক সবজি বাগান পরিবারের সদস্যদের নিজেদের পছন্দমতো করা হয়। তবে নিবিড় পদ্ধতিতে সবজি চাষ করতে হলে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত মডেল অনুসরণ করা যায়। এই মডেলে সারা বছরই বসতবাড়ির বাগানে কোনো না কোনো শাকসবজির চাষ করা যায়।

সবজি বাগানের জন্য নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করতে হবে—

১. নির্বাচিত জমির চারদিকে ৫০ সেন্টিমিটার বেড়া ও নালা তৈরির জন্য জায়গা রাখতে হবে। বাকি ৫৫ বর্গমিটার জমিকে ৫টি সমান ভাগে ভাগ করতে হবে।



সবজি বাগানের নকশা

২. জমির প্রতিটি খণ্ডকে এক একটি বেড বলা হয়। এই বেড লম্বায় ৫ মিটার এবং প্রস্থে ৮০ সেন্টিমিটার হবে।

৩. প্রতিটি নালার গভীরতা হবে ২০–২৫ সেন্টিমিটার। যে কোনো একপাশের নালা একটু বেশি গভীর হবে, যেন বৃষ্টির পানি সহজে গড়িয়ে যেতে পারে।

৪. নালার মাটি তুলে গোবর সার মিশিয়ে প্রতিটি জমির খণ্ডকে ২০–২৫ সেন্টিমিটার উঁচু করতে হবে।

সবজি বাগানের ৫টি বেডে সারা বছর মোট ১৪ ধরনের সবজি চাষ করা হয়। এছাড়াও চারপাশের বেড়াকে বাউনি হিসেবে ব্যবহার করে শীত মৌসুমে দেশি শিম, উচ্ছে, মটরশুঁটি এবং গ্রীষ্মে বরবটি, ধুন্দল, কাকরল চাষ করা হয়।

১. মুলা/টমেটো–লালশাক–পুঁইশাক।

২. লালশাক + বেগুন–লালশাক–ঢেঁড়স।

৩. লালশাক, পালংশাক–রসুন–লালশাক–ডাঁটা।

৪. বাটিশাক–পেঁয়াজ বা গাজর–কলমিশাক–লালশাক।

৫. বাঁধাকপি–লালশাক–করলা–লালশাক।

১ম বেডে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে মুলার বীজ ছড়াতে হবে। মুলা তোলার দুই সপ্তাহ আগেই একই জায়গায় ফাঁকে ফাঁকে টমেটো চারা লাগাতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতে লালশাক বুনতে হবে। এই লালশাক মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে আবার লালশাক বুনে তা মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তোলা যাবে। পুঁইশাক মে মাসের প্রথমেই লাগাতে হবে। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত শাক তোলা যাবে।

২য় বেডে লালশাক ও বেগুন একই সাথে চাষ করতে হবে। এই বেডে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত বেগুন ফসল সংগ্রহ করা যাবে। বেগুন তোলার পর লালশাকের বীজ লাগাতে হবে। ১৫ই এপ্রিল থেকে শাক সংগ্রহ করা শুরু করা যাবে। মে মাসের প্রথমে ঢেঁড়স লাগাতে হবে। ১৫ই জুন থেকে আগস্টের শেষ পর্যন্ত ঢেঁড়স তোলা যাবে। সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে লালশাক বুনতে হবে।

৩য় বেডে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে লালশাক বুনতে হবে। ১০ই অক্টোবরের মধ্যে লালশাক তোলা শেষ হবে। লালশাক তোলার পর পালংশাক বুনতে হবে। নভেম্বর মাসের শেষে রসুন লাগাতে হবে। মার্চের প্রথম দিকে রসুন তুলেই লালশাক লাগাতে হবে। এপ্রিল মাস পর্যন্ত লালশাক তোলা যাবে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে ডাঁটার বীজ বুনতে হবে। আগস্টের শেষ পর্যন্ত ডাঁটা তোলা যাবে।

৪র্থ বেডে অক্টোবরের শুরুতেই বাটিশাক লাগাতে হবে। বাটিশাক তোলার পর ডিসেম্বরে পেঁয়াজ বা গাজর বুনতে হবে। ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে পেঁয়াজ/গাজর তুলে শেষ সপ্তাহের মধ্যে কলমিশাক লাগাতে হবে। জুলাই মাসের মধ্যে কলমিশাক তুলে আগস্টে লালশাকের বীজ বুনতে হবে।

৫ম বেডে ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে বাঁধাকপির চারা লাগাতে হবে। বাঁধাকপি তোলা শেষ হলে ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে লালশাকের বীজ বুনতে হবে। এপ্রিলের মাঝামাঝি করলার বীজ লাগাতে হবে। জুনের মাঝামাঝি থেকে জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত করলা তোলা যাবে। করলা তুলে ১৫ই আগস্টের মধ্যে লালশাক বুনতে হবে।

সবজি চারা লাগানো ও পরিচর্যা

শাকসবজির চারা লাগানোর জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হল—

জমি প্রস্তুতকরণ

পারিবারিক সবজি বাগানের জমির পরিমাণ কম থাকে। প্রথমে জমিকে কোদাল দিয়ে ভালোভাবে কুপিয়ে ৬–৭ দিন ফেলে রাখতে হবে। মাটির মধ্যে কোনো রোগবালাই থাকলে রোদের তাপে নষ্ট হয়ে যায়।

৬–৭ দিন পর মাটি ভালোভাবে ভেঙে গুঁড়া করতে হবে। তারপর বেড ভাগ করে দুই বেডের মাঝখানে নালা করতে হবে। বেডের মাটির সাথে পচা গোবর সার বা আবর্জনা ভালোভাবে মিশাতে হবে। প্রতি বেডে ২০ কেজি গোবর সার ও আবর্জনা পচা দিতে হবে।

বীজ বা চারা বপন

২য় ধাপ হল বীজ বা চারা বপন। চারা সবসময় সারি করে বপন করা ভালো। এতে ফলন ভালো হয় এবং জমিতে সেচ ও সার দিতে সুবিধা হয়। আগাছা পরিষ্কার করতেও সহজ হয়। মুলা, লালশাক, ডাঁটাশাক, পালংশাক, গাজর ও ঢেঁড়সের বীজ সারি করে বেডে লাগাতে হবে। এই বীজগুলো খুব ছোট তাই গুঁড়া মাটি বা ছাইয়ের সাথে মিশিয়ে বুনতে হয়। তাহলে সমানভাবে সব জায়গায় সঠিক দূরত্বে বীজ বোনা হয়।

বেগুন, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পুঁইশাক, টমেটো, রসুনের কোয়া, পেঁয়াজের চারা ইত্যাদি সারি করে লাগাতে হয়। চারা সাধারণত বিকালে লাগানো ভালো। চারা লাগানোর পর তিন চারদিন বেলা ওঠার সাথে সাথে কলা গাছের খোলা দিয়ে চারা ঢেকে দিতে হবে। কারণ চারা গাছ প্রখর সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না। বিকালে ঢাকনাগুলো সরিয়ে রাখতে হবে। চারাগুলো শিকড় শক্ত করে মাটিতে দাঁড়াতে পারলে আর ঢাকনা দিতে হয় না।

পরিচর্যা

পানি দেওয়া

বীজ মাটিতে লাগানোর পর ২–৩ দিন পানি দিতে হয় না। চারা গজালে ঝাঁঝরি দিয়ে সাবধানে পানি দিতে হয়। গাছের অনেক ওপর থেকে পানি দিলে বা গোড়ায় সরাসরি বেশি পানি দিলে গোড়া পচে যায়।

মাটি আলগা করা

গাছের গোড়ার মাটি মাঝে মাঝে আলগা করে দিতে হয়। এতে মাটির মধ্যে আলোবাতাস চলাচলের সুবিধা হয়। আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

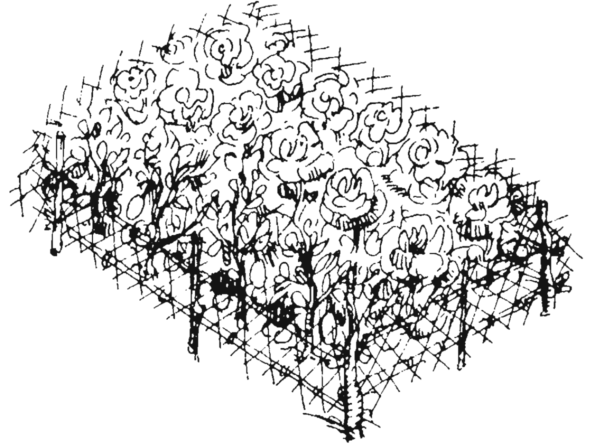
গাছ বেশি ঘন হয়ে গেলে মাঝে মাঝে তুলে পাতলা করে দিতে হয়। রোগাক্রান্ত, দুর্বল চারা তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

সার দেওয়া

সার দেওয়ার সময় সাবধান হতে হবে যেন গাছের গোড়া বা শিকড়ে সার না লাগে। গাছ থেকে ১৫ সে. মি. দূরে মাটির সাথে মিশিয়ে সার দিতে হবে।

বেড়া দেওয়া

মুরগি, গরু, ছাগলের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাগানের চারপাশে বেড়া দিতে হবে। শিম, বরবটি, লাউ ইত্যাদি লতানো গাছ একটু বড় হলেই মাচার ব্যবস্থা করতে হবে। বেশি ফল পেতে হলে লতানো গাছের গোড়ার অপ্রয়োজনীয় ডাল বা শাখা প্রশাখা কেটে দিতে হয়।



চারদিকে বেড়া দেওয়া একটি সবজি বাগান

রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন

অনেক ধরনের রোগবালাই আছে যার আক্রমণ এবং পোকামাকড়ের আক্রমণে ফসলের বেশ ক্ষতি হয়। নিচে কয়েকটি রোগ ও পোকামাকড় দমন সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

সবজির বিভিন্ন প্রকার রোগ ও দমন ব্যবস্থা

রোগের নাম	সবজির নাম ও রোগের লক্ষণ	দমন ব্যবস্থা
সাধারণ মোজাইক	শিম, বেগুন : পাতা হলুদ হয়, পাতার আকার ছোট হয়ে যায়।	রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। জাব পোকার আক্রমণ দমন করতে হবে।
চারা হাজা রোগ	টমেটো, কপি, মুলা : গাছের গোড়া পচে যায়, চারা গাছ ঢলে মারা যায়।	গাছের গোড়ায় পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, মাটি আলগা করা, আক্রান্ত চারা বা গাছ তুলে ফেলতে হবে।
পাউডারি মিলডিউ	লাউ, কুমড়া, শসা, মটরশুঁটি : গাছের কান্ড ও পাতায় সাদা পাউডারের মতো পদার্থ লেগে থাকে।	১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম ক্যারোথিন থিয়োভিট গুলিয়ে ছিটাতে হবে।
পাতায় দাগ পড়া রোগ	বেগুন, টমেটো, লাউ, শিম, ঢেঁড়স, ঝিঙে, কাকরল : কান্ড ও পাতায় কালচে দাগ পড়ে।	১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম ছত্রাকনাশক ওষুধ ছিটাতে হবে।
কুঠে রোগ	টমেটো : পাতা কুঁকড়ে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।	আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। কীটনাশক ওষুধ ছিটাতে হবে।

পোকামাকড়

পোকামাকড় সবজি গাছের প্রধান শত্রু। নানা প্রকার পোকা গাছের অনিষ্ট করে থাকে। কীভাবে এসব পোকা দমন করতে হয় নিচে বর্ণনা দেওয়া হল।

পিঁপড়া ও মাকড় : বীজতলার বীজ খেয়ে ফেলে এবং গাছের গোড়ার মাটির ক্ষতি করে। মাকড় পোকা পাতার নিচে জাল বোনে এবং পাতার রস খেয়ে নেয়। ১ লিটার পানিতে ২–৩ লিটার ডায়লড্রিন মিলিয়ে স্প্রে করলে নতুবা পানিতে কেরোসিন মিশিয়ে স্প্রে করলে পিঁপড়া ও মাকড় মরে যায়।

বিটল ও লেদা পোকা : এ ধরণের পোকা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে। গাছের নরম পাতা ও ডগা খেয়ে ফেলে। ১ লিটার পানিতে ১ গ্রাম সেভিন/কারবারিল মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

বোরার : সবজি ছিদ্রকারী পোকা। বেগুন, টমেটো ইত্যাদি ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে যায়। ১ লিটার পানিতে ১ চা চামচ রিপকর্ড ইসি বা শিমবুস ইসি মিশিয়ে সিঞ্চন করতে হয়।

মাছি পোকা : গাছের কচি পাতা ও কান্ড খেয়ে ফেলে। ১০০ গ্রাম মিষ্টি কুমড়ার ডগার সাথে আধ গ্রাম ডিপটেরেক্স মিশাতে হবে। মাটির পাতিল $\frac{৩}{৪}$ অংশ ভরে ৮–১২ মিটার দূরে দূরে রাখলে মাছি বিষটোপে আটকে পড়ে মারা যায়।

গৃহাঙ্গানে ফলের চারা লাগানো ও পরিচর্যা

আমাদের দেশে প্রায় বাড়ির সামনে বা পিছনের খালি জায়গায় কোনো না কোনো ফলের গাছ দেখা যায়। বাগান আকারে ফলের চাষ করতে হলে অনেক জমির প্রয়োজন। তাই বাড়ির চারদিকে বাইরের দেয়ালের পাশেই ফলের চারা রোপণ করা হয়।

ফল গাছ লাগাবার জমির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকবে :

১. উঁচু জায়গা যেখানে পানি জমে থাকে না।

২. ১০০ মিটার গভীর পর্যন্ত একই রকম মাটি।

৩. পাথর ও কাঁকর ছাড়া মাটি।

৪. রোদ পড়ে এমন জায়গা এবং যেখানে ঘর কিংবা গাছের ছায়া পড়ে না।

গর্ত খনন

ফল গাছ লাগানোর উপযোগী গর্ত তৈরি করতে হবে। অধিকাংশ ফল গাছের জন্য ৬০ সেন্টিমিটার চওড়া গর্ত করতে হবে। গর্তের ওপরের ও নিচের মাটি দুভাগে রাখতে হবে, যাতে পরে ওপরের মাটি গর্তের নিচে এবং নিচের মাটি ওপরে দেওয়া যায়। গর্ত করার পর ৭ দিন গর্তটি জীবাণুমুক্ত করার জন্য রোদে শুকাতে হবে।

সার প্রয়োগ

গর্তে মাটির সাথে পচা গোবর সার কিংবা কমপোস্ট সার, ইউরিয়া, টিএসপি ও ছাই মিশাতে হবে। গর্তটি সারযুক্ত মাটি দিয়ে এমনভাবে ভরতে হবে যাতে জমি থেকে গর্তের মাটি ১০ সেন্টিমিটার ওপরে থাকে। গর্ত ভরাটের পর পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে যেন মাটি বসে যায়। ১ সপ্তাহ পর গর্তের মাটি নিড়ানি দিয়ে আলগা করে দিতে হবে।

চারা রোপণ

চারা রোপণ করতে হবে বিকালবেলা। চারা রোপণের পর গর্তের মাটি ভিজিয়ে দিতে হয়। একটি শক্ত কাঠি চারার পাশে পুঁতে চারাটি বেঁধে দিতে হয়। তাহলে গাছটি সোজা হয়ে উঠবে। চারায় প্রথম কিছুদিন ছায়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

চারা লাগানোর সময় দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। আম, কাঁঠাল ও জলপাইয়ের এক গাছ থেকে অন্য গাছের দূরত্ব ১০–১২ মিটার। কামরাঙা, পেয়ারা, বেল, ডালিম, পেঁপে গাছের দূরত্ব ৪–৬ মিটার হবে।

পরিচর্যা

ছোট থাকাকালীন সময় চারা গাছকে গরু ছাগলের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য বাঁশের উঁচু খাঁচা দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। চারার গোড়া মাঝে মাঝে খুঁচিয়ে আলগা করে দিতে হবে। আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। গোড়ায় যাতে পানি না জমে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। বছরের প্রয়োজনীয় সার দু ভাগ করে গ্রীষ্মের শুরুতে এক ভাগ ও বর্ষার শেষে আর এক ভাগ দিতে হবে। ফল থাকা অবস্থায় গাছে সার না দেওয়া ভালো। খরার সময় গাছের গোড়া আবর্জনা বা কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়।

ঋতু ভিত্তিক ফল চাষ

বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়–শ্রাবণ	পৌষ–মাঘ	বারমাসি
আম, জাম	পেয়ারা, আনারস	কমলা, জলপাই	নারিকেল, কলা
লিচু, কাঁঠাল	আমড়া, চালতা	বেল	পেঁপে
ডালিম, তরমুজ	লেবু, সফেদা		

ফলের বিভিন্ন প্রকার রোগ ও দমন ব্যবস্থা

ফলের নাম	রোগের নাম	লক্ষণ	দমন ব্যবস্থা
আম	ক) পাউডারি মিলডিউ	ফুলে ও ছোট ছোট ফলে ধূসর বর্ণের সাদাটে পাউডার দেখা যায়।	পানি ০.২% সালফার বা কারাথেন ০.১% মিশ্রিত করে ফুল আসার আগে ছিটাতে হবে।
	খ) এ্যানথ্রাকনোজ	গাছের স্থানে স্থানে কালোদাগ পড়ে। শাখা ও ফুল মরে যায়।	১ লিটার পানিতে, ১ গ্রাম তুঁতে ও ১০০ গ্রাম চুন মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে এবং গাছের নিচের মরা পাতা পুড়ে ফেলতে হবে।
কলা	ক) পানামা খ) বানচিটপ ভাইরাস	পাতার রং হলুদ হয়। গাছের পাতার বৃদ্ধি কমে যায়, পাতা আকারে খাটো এবং অপ্রশস্ত হয়। ওপরের দিকে খাড়া হয়।	আক্রান্ত গাছ গোড়াসহ উঠিয়ে পুড়ে ফেলতে হবে। আক্রান্ত গাছ গোড়াসহ উঠিয়ে পুড়ে ফেলতে হবে।
পেঁপে	ড্যাম্পিং অফ	বর্ষা মৌসুমে কান্ড পচে যায়, গাছ ঢলে পড়ে।	গাছের গোড়ার পানি সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বীজতলার মাটি ৫% ফরমাল–ডিহাইড দ্বারা জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
লেবু	প্রজাপতি	পোকায় গাছের পাতা খেয়ে ফেলে।	ডিম ও পোকাযুক্ত পাতা সংগ্রহ করে পুঁতে বা পুড়ে ফেলতে হবে।
পেয়ারা	এ্যানথ্রাকনোজ	পেয়ারার গায়ে বাদামি রঙের দাগ বড় হয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।	গাছের নিচে ঝরে পড়া ফল ও পাতা সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. ব্যক্তির জীবনে ব্যবস্থাপনা আচরণের বিকাশ ঘটে–
   ক. অফিস আদালতে   খ. গৃহ পরিবেশে
   গ. স্কুল কলেজে   ঘ. কর্মক্ষেত্রে

২. আদিম যুগের মানুষ বাস করত–
   ক. গৃহে   খ. গুহায়
   গ. রাস্তায়   ঘ. বনে

৩. গোয়াল ঘরের অবস্থান হবে–
   ক. বাড়ির কাছাকাছি   খ. রান্নাঘরের পাশে
   গ. বাড়ি থেকে দূরে   ঘ. পুকুরের পাড়ে

৪. নিবিড় সবজি বাগানের বেডের সংখ্যা
   ক. ২   খ. ৪
   গ. ৫   ঘ. ১০

৫. নিবিড় সবজি বাগানের নালার গভীরতা কত সে. মি হবে–
   ক. ৫–১০   খ. ৮–১০
   গ. ১০–১৫   ঘ. ২০–২৫

৬. নিবিড় সবজি বাগানের আকার হবে–
   ক. বর্গাকার   খ. আয়তাকার
   গ. ত্রিভুজাকার   ঘ. চতুর্ভুজাকার

৭. প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ হল–
   i. তুলা ও ব্যান্ডেজ
   ii. কাঁচি ও বার্নল
   iii. ব্যথানাশক ওষুধ

   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i   খ. i ও ii
   গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও ii

৮. সবজি গাছের গোড়া পচে যাওয়াকে কোন রোগ বলে?
   i. কুঠে রোগ
   ii. চারাহাজা রোগ
   iii. পাউডারি মিলডিউ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৯. পানিতে কেরোসিন মিশিয়ে আমরা কী ধরনের পোকা–মাকড় ধ্বংস করতে পারি?

i. পিঁপড়া ও পোকামাকড়।

ii. বিটল ও লেদা পোকা।

iii. বোরার ও মাছি।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সোনিয়া তার গৃহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে খুব সচেতন। তার ঘরের জানালাগুলো কাচের কিন্তু কোনো গ্রিল নেই। তার রান্নাঘর খুব গোছানো, ফলে রান্নার উপকরণের কোনো অপচয় হয় না। প্রতি মাসের শেষে তার কিছু সঞ্চয় হয়।

ক. গৃহ কী?

খ. গৃহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্যাখ্যা কর।

গ. সোনিয়া কীভাবে তার ঘরের জানালা পরিষ্কার করেন?

ঘ. প্রতিমাসে সোনিয়ার সঞ্চয় করার উপায় আলোচনা কর।

২. রুমা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। পরিবারের সবার সাথে সে পারিবারিক সবজি বাগানে কাজ করে। তারা নিবিড় সবজি চাষ পদ্ধতিতে বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ করে। রুমা প্রায়ই বাগানে প্রচুর পানি দেয়। কিছুদিন পর দেখা গেল গাছগুলোর গোড়া পচে গেছে।

ক. পারিবারিক সবজি বাগান কী?

খ. নিবিড় সবজি চাষ বলতে কী বুঝায় বর্ণনা কর।

গ. রুমা কী করলে তার সবজি গাছগুলোকে রক্ষা করতে পারত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নিবিড় সবজি চাষের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ কর।

৩. আবির তাদের বাড়ির পিছনে খালি জায়গায় আগাছা পরিষ্কার করে মাটি তৈরি করল। তারপর নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর পেয়ারা ও পেঁপে গাছ লাগালো। সে সঠিকভাবে বাগানের গাছের পরিচর্যা করে কিন্তু চারা বড় হওয়ার পর বর্ষার মাঝামাঝি কয়েকটি পেঁপে গাছ ঢলে পড়তে দেখে সে চিন্তিত হয়ে পড়ল।

ক. মাটি প্রস্তুত করার ১টি সরঞ্জামের নাম লিখ।

খ. একত্রে পেয়ারা ও পেঁপে গাছ রোপণের সুবিধা ব্যাখ্যা কর।

গ. আবির কীভাবে বাগানের গাছগুলোর পরিচর্যা করে বর্ণনা কর।

ঘ. আবির কী পদক্ষেপ নিলে পেঁপে গাছকে ঢলে পড়া থেকে রক্ষা করতে পারত ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিবার ও সমাজ

পরিবারের উৎপত্তি

পরিবার সর্বাপেক্ষা আদিম প্রতিষ্ঠান। পরিবারের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক মতভেদ রয়েছে। অনেকের ধারণা, আদিকাল থেকে মানুষ ছোট ছোট পরিবারে বাস করত। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, হিংস্র জানোয়ারের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ প্রথমে দলবদ্ধভাবে বাস করত। পরবর্তীতে ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত হয়।

প্রাণিজগতেও পরিবারের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এক জোড়া পাখি একত্রে বসবাস করে বাসা তৈরি করে, ডিম পাড়ে, বাচ্চা দেয়, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, খাদ্য সংরক্ষণ করে। কারও কারও ধারণা, যখন থেকে মানুষ কৃষিকাজকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে তখন থেকেই পরিবারের উৎপত্তি। প্রেম, প্রীতি, স্নেহ মমতা ইত্যাদির অনুপ্রেরণায় মানুষ পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ হয়।

পরিবারের সংজ্ঞা

পরিবার একটি সামাজিক সংগঠন। এ সংগঠন থেকেই মানবজাতির বিকাশ ঘটেছে। একটি পুরুষ ও একটি নারীর বিয়ের মাধ্যমে পরিবারের সূত্রপাত হয়। সন্তান জন্মের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পরিবারের বিস্তৃতি ঘটে।

সমাজবিজ্ঞানী নিমকফের মতে, পরিবার মোটামুটিভাবে স্বামী ও স্ত্রী দ্বারা সৃষ্ট একটি সংগঠন যেখানে সন্তানসন্ততি থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে।

অন্যকথায় পরিবার হল, বিয়ের সম্পর্ক দ্বারা গঠিত নির্দিষ্ট জুটি, যেখানে সন্তান লালনপালনের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকবে।

পরিবারের বৈশিষ্ট্য

যে কোনো পরিবার বিশ্লেষণ করলে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায়, যা আদর্শ পরিবার গঠনের জন্য অত্যাবশ্যক।

১. নির্দিষ্ট সদস্য সংখ্যা	২. সংঘবদ্ধতা	৩. নির্দিষ্ট বাসস্থান	৪. ধর্ম মতের মিল
৫. আয়ের সংস্থান	৬. বংশ বৃদ্ধি	৭. রুচির মিল	৮. স্থায়িত্ব

পরিবারের কাঠামো/প্রকারভেদ

সাধারণত বাংলাদেশে চার ধরনের পরিবার দেখা যায়—

১. মাতৃপ্রধান পরিবার

এ ধরনের পরিবারে মায়ের কর্তৃত্বই বেশি। সন্তানসন্ততি মায়ের পরিচয়েই পরিচিত। মাতৃপ্রধান পরিবারে স্বামীকে বিবাহ সূত্রে স্ত্রীর পরিবারের সাথে বসবাস করতে হয়। এ ধরনের পরিবারে উত্তরাধিকার সূত্রে কন্যা মাতার সম্পত্তির অধিক অংশের অধিকারী হয়। বাংলাদেশে উপজাতীয়দের মধ্যে এখনও কিছু কিছু মাতৃপ্রধান পরিবার দেখা যায়।

২. পিতৃপ্রধান পরিবার

বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবার পিতৃপ্রধান, পিতা পরিবারের কর্তা। সন্তানসন্ততি তার পরিচয়েই পরিচিত হয়। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পিতাই নেন। পরিবারের সদস্যগণ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে।

৩. একক পরিবার

স্বামী, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নিয়ে একক পরিবার গঠিত। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে এ ধরনের পরিবার বেশি। আধুনিক যুগে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্প কারখানার প্রসারের সাথে সাথে গ্রামের লোকজন যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চাকরির আশায় শহরে আসছে এবং একক পরিবার গঠন করে বসবাস করছে।

৪. যৌথ পরিবার

মা বাবা, ভাই বোন, চাচা চাচি, দাদা দাদি একই বাসস্থানে একান্নবর্তী হয়ে বসবাস করেন।

কয়েকটি একক পরিবারের সমষ্টি যৌথ পরিবার। এ পরিবারের যোগসূত্র হল রক্তের সম্পর্ক। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যৌথ পরিবারে কর্তৃত্ব করেন। পরিবারের সদস্যরা তাঁর নির্দেশ মেনে চলেন। তিনি সকলের চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করেন। কৃষিকাজের সুবিধার জন্য জনশক্তির চাহিদা থাকায় গ্রামাঞ্চলে আজও যৌথ পরিবারের সংখ্যা বেশি।



একক পরিবার



যৌথ পরিবার

পরিবারের কাজ

পরিবারের রূপ এবং কাঠামোর পরিবর্তন হলেও কিছু সাধারণ কাজ আছে যা সব পরিবারের জন্য প্রযোজ্য। বিভিন্ন কাজের মধ্যে নিম্নের কাজগুলোই প্রধান :

১. জৈবিক কাজ

বিবাহ বন্ধনের একটি লক্ষ্য হল সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করা। এটাই পরিবারের জৈবিক কাজ।

২. শিশু লালন–পালন কাজ

মা বাবা ও পরিবারের সদস্যদের আদরযত্নে শিশু ধীরে ধীরে বড় হয়। তাদের চাহিদা পূরণ করে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব থাকে মা বাবা ও পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের ওপর।

৩. শিক্ষামূলক কাজ

পরিবারই শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র। লেখাপড়া ছাড়াও পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে শিশু আদব কায়দা; শিষ্টাচার শিক্ষা লাভ করে। ভালো, মন্দ, ন্যায়নীতি, দয়া, সহানুভূতিশীলতা ইত্যাদি নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি শিশুদের শেখানো পরিবারের দায়িত্ব।

৪. অর্থনৈতিক কাজ

পরিবার তার সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তা দেয়। পরিবারে মা বাবা, বয়োজ্যেষ্ঠরা আয় রোজগার করেন। অন্যান্য সদস্যরাও নানারকম বৃত্তিমূলক কাজ করে পরিবারের আর্থিক উন্নতি করেন। পরিবারের সদস্যগণ সেলাই, রান্না, বাগান করা, কুটির শিল্প ইত্যাদি অর্থকরী কাজে অংশ নিতে পারেন।

৫. রাজনৈতিক কাজ

বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা পরিবারের কাজ। এরূপ সম্পর্ক সদস্যদের একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করবে।

৬. মনস্তাত্ত্বিক কাজ

দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালোবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলো জাগানো পরিবারের কাজ। একে অন্যের মনমানসিকতার কথা ভেবে আচরণ করতে শেখানো পারিবারিক দায়িত্ব।

৭. বিনোদনমূলক কাজ

খেলাধুলা, গল্পগুজব, টিভি দেখা, পত্র–পত্রিকা পাঠ করার মাধ্যমে পরিবারে বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়। সারাদিনের ক্লান্তির পর পরিবারের সদস্যরা এসব বিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে।

সমাজ

কয়েকটি পরিবার মিলে গড়ে ওঠে একটি সমাজ। মানুষ সামাজিক জীব। একা বাস করতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বা বিরাটাকার দলে বসবাস করে। আদিম যুগেও মানুষ হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দলবদ্ধভাবে বাস করত। মানুষ তার শান্তি, নিরাপত্তা ও মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। দৈনন্দিন জীবন যাপন, অর্থ উপার্জন, শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্ম এমনকি মৃতের সৎকার সবকিছুতেই সমাজের সাহায্য প্রয়োজন।

সংজ্ঞা

মানুষ পরস্পরের সাথে মিলেমিশে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি একত্রিত হয় বা কোনো সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমাজ বলে। সুতরাং মানুষ নিয়েই সমাজ। পরিবার, গোত্র, সম্প্রদায় এরকম প্রতিষ্ঠান নিয়ে সমাজ গড়ে ওঠে। প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো সমাজে বাস করে। বিপদে আপদে একে অন্যকে সাহায্য করে। মানুষের উন্নতি ও কল্যাণ সাধনই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষের জীবনে সমাজের গুরুত্ব অপরিসীম। দৈনন্দিন জীবন যাপন ও পরিবারের কাজগুলো সঠিকভাবে সমাধা করার জন্য গড়ে উঠেছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান। যেমন-কর্মক্ষেত্র, অফিস আদালত, স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, পার্ক লাইব্রেরি ইত্যাদি।

মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনই এসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। মানুষকে সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক সুযোগ সুবিধা দেয়।

সামাজিক রীতিনীতি

প্রত্যেক সমাজেই নিজস্ব রীতিনীতি ও বিধিনিষেধ রয়েছে। এসব রীতিনীতি মেনে চলা প্রত্যেক সামাজিক সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য। যেমন-সামাজিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা, সমাজের লোকজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা ইত্যাদি।

অন্যদিকে পাড়া প্রতিবেশীদের বিরক্ত করা, রাস্তাঘাট নোংরা করা, বড়দের কটু কথা বলা, বড়দের সামনে অশালীন ব্যবহার করা, সামাজিক সম্পদ নষ্ট করা এগুলো কোনো সমাজেই গ্রহণীয় আচরণ নয়।

সামাজিক নিয়মকানুন মেনে না চললে সমাজ ভালো চোখে দেখে না, সমালোচনা করে। অনেক সময় সামাজিক আইনে বিচার হয় এবং শাস্তি দেওয়া হয়। আবার যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি সামাজিক বিধিবিধান মেনে চলে সেখানে অন্যায়, অবিচার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা থাকে না। সে সমাজকে সুষ্ঠু বা আদর্শ সমাজ বলা যেতে পারে। যাঁরা সামাজিক নিয়মকানুন মেনে চলেন, তাঁরা রাষ্ট্রীয় জীবনেও দেশের আইনকানুন মেনে চলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরিবার ও সমাজের পার্থক্য

পরিবার ও সমাজের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলে দেখা যায়, দুটোই মানুষের কল্যাণে গঠিত। পরিবার সন্তানসন্ততির বিকাশ সাধনে গড়ে উঠেছে। সমাজের উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করা। এ সম্পর্ক সৃষ্টি মানুষের পরস্পরের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। মানুষ নিয়েই পরিবার ও সমাজ গঠিত। বিভিন্ন কারণে দুটির মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও আকার ও প্রকারের কিছু পার্থক্য রয়েছে। সেগুলো নিচে দেখানো হল—

পরিবার	সমাজ
১. পরিবার সমাজের ক্ষুদ্র একক।	১. সমাজ রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র একক।
২. পরিবার সমাজের ভিত্তি।	২. সমাজ রাষ্ট্রের ভিত্তি।
৩. পারিবারিক জীবনের প্রথম উৎস হল নারী ও পুরুষ বা স্বামী ও স্ত্রী।	৩. সমাজ জীবনের প্রথম অণু পরিবার।
৪. স্বামী, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন নিয়ে পরিবার গঠিত।	৪. কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি সমাজ গঠিত।
৫. পরিবারের সদস্যগণ একই গৃহে বাস করে।	৫. সমাজের বিভিন্ন সদস্য ভিন্ন ভিন্ন গৃহে বাস করে।
৬. পরিবার কোনো প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত নয়।	৬. স্কুল, ক্লাব, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে সমাজ গঠিত।
৭. পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।	৭. সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক একে অন্যের উদ্দেশ্য সাধনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।
৮. সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা পরিবারের কাজ পরিচালিত।	৮. প্রত্যেক সমাজ নিজস্ব রীতিনীতি দ্বারা পরিচালিত।
৯. পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন সমাজের পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল।	৯. সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন বিজ্ঞানের উন্নতির ওপর নির্ভরশীল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরিবার ও পরিবারের সদস্যবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পরিবার সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংগঠন। এখানে শিশু থেকে বৃদ্ধ বয়সের সদস্য বাস করে। প্রত্যেকের চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন। পরিবারের লক্ষ্য থাকবে সকলের চাহিদা পূরণ করে একটি সুখী পরিবেশ গড়ে তোলা। পরিবারের কাজগুলো সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য সদস্যদের সহযোগিতার প্রয়োজন। সংসারে প্রত্যেকেই যদি নিজ দায়িত্ব পালন করে তাহলে একজনের ওপর তেমন অতিরিক্ত পরিশ্রমের ভার পড়ে না। অনেক পরিবারে দেখা যায় গৃহকর্ত্রীর ওপর অমানুষিক দায়িত্বভার। কারণ

সেসব পরিবারের সদস্যরা নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয়। পরিবার যৌথ প্রচেষ্টার ফল, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এ ধারণা থাকলে পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ হয়।

মাতা পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

পরিবারে বাবা অথবা মা গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব বাবার ওপর থাকে। মা যদি চাকরি করেন তার উপার্জনও পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। অর্থ ব্যয়ের দায়িত্ব দুজনের ওপরই থাকে। ছেলেমেয়েদের লালন-পালন, খাদ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব মা পালন করেন। শিক্ষা ও চিকিৎসার দায়িত্বভার মা বাবা দুজনের ওপর থাকে। ছেলেমেয়েদের আদব কায়দা শিক্ষা দিয়ে সুপথে পরিচালনার জন্য মা বাবা নিরলস চেষ্টা করেন। ছেলেমেয়েরা কোন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নেবে বা কোন পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করবে সেখানে মা বাবা পরামর্শ দিয়ে থাকেন। পরিবারে সন্তানসন্ততি, মাতা পিতাকে অনুসরণ করে। মা বাবাকে ছেলেমেয়েদের সামনে আদর্শ চরিত্রের রূপ প্রদর্শন করতে হবে। অর্থাৎ স্নেহ মমতা, দয়া, সহানুভূতিশীলতা, ধৈর্য ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন। যেন ছেলেমেয়েরা এসব গুণাবলি নিজের চরিত্রে স্থাপন করে ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল স্বাবলম্বী নাগরিকরূপে গড়ে ওঠে।

সন্তানসন্ততির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ছাড়াও পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তি, যেমন-শ্বশুর শাশুড়ি বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের দেখাশোনা মা বাবা করেন। তাদের খাওয়া দাওয়ার প্রতি নজর রাখেন। অসুখ বিসুখে যত্ন নেন। অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর প্রতি সচেতন থাকেন। সর্বোপরি মাতা পিতার দায়িত্ব পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটি সুসম্পর্কের বন্ধন সৃষ্টি করা।

ভাইবোনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পরিবারে ভাইবোনের সম্পর্ক সাধারণত ঘনিষ্ঠ থাকে। মা বাবা সন্তানদের প্রতি যেমন স্নেহপরায়ণ হন তেমনি তাদেরও উচিত মা বাবা এবং পরিবারের বড়দের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা দেখানো। বড়দের আদেশ উপদেশ মেনে চলা। পরিবারের আইনকানুন মেনে চলা ভাইবোনের কর্তব্য। বড় ভাই, বড় বোন ছোটদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। ছোটদের প্রতি স্নেহ মমতা দেখাবে। ছোটরা বড়দের প্রতি অনুরূপ ভালোবাসা, শ্রদ্ধা দেখাবে। বড় ভাইবোন ছোট ভাইবোনদের


ছেলেরা বাবাকে বাগানের কাজে সাহায্য করছে


মেয়ে মাকে ঘর গোছানোর কাজে সাহায্য করছে

লেখাপড়ায় সাহায্য করবে। বোনেরা সাধারণত ছোট ভাইবোনদের যত্ন নিয়ে থাকে। এছাড়া পরিবারে মেয়ে হিসেবে মাকে নানা কাজে সাহায্য করে। মেহমান আসলে নাশতা দেওয়া, ঘর গোছানোর কাজে দায়িত্ব পালন করে। কেউ অসুস্থ থাকলে তাদের সেবাযত্নে পরিবারের মেয়েরা সাহায্য করে।

ছেলেদের দায়িত্ব একটু ভিন্ন ধরনের। তারা অল্প বয়সে নিজের বইপত্র, কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখতে পারে। বড় হলে বাবার সাথে বাইরের কাজ করে থাকে। যেমন বাজারে যাওয়া, ছোট ভাইবোনদের স্কুলে আনা নেয়া করা। বাড়িতে বাগানের কাজ করা ও মাঠ আঙিনা পরিষ্কার রাখতেও ছেলেরা বাবাকে সাহায্য করে। বাড়িতে বৃদ্ধ দাদা দাদি বা নানা নানি থাকলে ভাইবোনেরা তাঁদের সাথে গল্প গুজব করবে। তাঁদের সেবা যত্নে অংশগ্রহণ করে মা বাবাকে কাজের চাপ থেকে কিছুটা রেহাই দিতে পারে।

দাদা দাদির দায়িত্ব ও কর্তব্য

সংসারের কাজকর্ম পরিচালনায় দাদা দাদির ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কাজে দাদা দাদি সুচিন্তিত মতামত দিয়ে সাহায্য করেন। নাতি নাতনীদের প্রতি দাদা দাদির গভীর স্নেহ মমতা, আদরযত্ন খুবই মূল্যবান। কোনো পরিবারে মা বাবা দুজনই যদি চাকরি করেন সে পরিবারে ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার দায়িত্ব দাদা দাদির ওপর থাকে। শিক্ষিত দাদা দাদি, নাতি নাতনীদের লেখাপড়ার তদারক করেন।

অনেক সময় স্কুলে আনা নেয়ার দায়িত্ব পালন করেন। নাতি নাতনীদের বিয়ের ব্যাপারে দাদা দাদি অভিজ্ঞ মতামত রাখেন। পরিবারের প্রতি দাদা দাদির যেমন কর্তব্য রয়েছে তেমনি ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনীদের উচিত তাঁদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, মাঝে মাঝে তাঁদের সাথে গল্প করা, তাঁদের আদেশ উপদেশ মেনে চলা। এতে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হয়। অপরপক্ষে দাদা দাদিও নিজেদেরকে পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মনে করেন। এর ফলে তাদের একাকিত্ব মনোভাব দূর হয়।



দাদা দাদির সাথে নাতি নাতনী গল্প করছে

চাচা চাচির দায়িত্ব ও কর্তব্য

যৌথ পরিবারে চাচা চাচি এবং তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে একত্রে বসবাস করতে দেখা যায়। পরিবারে যদি চাচা চাচি বয়োজ্যেষ্ঠ হন তবে তাঁরাই গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। অন্যান্য সদস্যরা তাঁদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা দেখাবেন। তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দেবেন। চাচা চাচিও নিজেদের ছেলেমেয়েদের এবং ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের সমান দৃষ্টিতে দেখবেন। সকলের সমস্যার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে গৃহ পরিচালনা করবেন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হতে পারে। তখন নিজের ছেলেমেয়েদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে ন্যায়ভাবে সমাধান করবেন। পরিবারের যৌথ সম্পদকে নিজের মনে করে সংরক্ষণে সহায়তা করবেন। বাবার সাথে যৌথভাবে চাচাও আর্থিক সচ্ছলতার জন্য উপার্জন করবেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, সৎ চরিত্র গঠন ও পারিবারিক রীতিনীতি মেনে চলার জন্য চাচা চাচিরও প্রচেষ্টা থাকবে। সংসারে চাচা চাচি, পিতা মাতার মতো ভূমিকা পালন করে একটি স্নেহ মমতাময় পরিবেশ গড়ে তুলবেন।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য

একটি পরিবারে ফুফু, খালা, মামা ছাড়াও দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন থাকেন। প্রত্যেকে যদি নিজেকে পরিবারের একজন সদস্য ভাবেন সেখানে কোনোরকম বিরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। ছোট ছেলেমেয়েদের লালনপালন, লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে তাঁরা সহযোগিতা করতে পারেন। রান্না করা, ঘর গোছানো, অতিথি আপ্যায়নে গৃহকর্ত্রীকে সাহায্য করাও তাঁদের কর্তব্য। পুরুষ সদস্য বাজারে যেতে পারেন, ঘরবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় গৃহকর্তাকে সহায়তা করতে পারেন, মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের স্কুলে আনা নেয়ার দায়িত্বও পালন করতে পারেন। তাঁদের মধ্যে স্নেহপরায়ণতা, সহযোগিতা ও উদার মনোভাব থাকলে পরিবারের সাথে একাত্ম হয়ে বসবাস করা সম্ভব। অন্য সদস্যরা এসব আত্মীয়স্বজনকে উপযুক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করবেন। তাঁদের মনে কষ্ট দিয়ে কোনো কথা বলবেন না। তাঁদের সুবিধা অসুবিধা লক্ষ করে প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর প্রতি সচেষ্ট থাকবেন। তাদেরকে পরিবারের বাহুল্য মনে করে অবহেলা করবেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরিবারের সদস্য হিসেবে শিশুর স্থান

প্রতিটি শিশুই পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। খুব ছোটবেলায় তারা কথা বলতে পারে না, ভালোমন্দ বোঝে না, কোনো কাজে অংশ নিতে পারে না। তাই বলে তারা কোনোমতেই অবহেলার পাত্র নয়। পরিবারে প্রত্যেক শিশুর নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। বড়দের মতো তাদেরও চাহিদা রয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র, পোশাক, চিকিৎসা ইত্যাদি চাহিদা পূরণের জন্য শিশু অন্যের ওপর নির্ভরশীল। চার পাঁচ বছর বয়স থেকে তারা ধীরে ধীরে এসব চাহিদা পূরণে সমর্থ হয়। পরিবার পরিজনদের দায়িত্ব শিশুর চাহিদাগুলো জানা ও এসব চাহিদা সুষ্ঠুভাবে পূরণ করে একজন সুষ্ঠু নাগরিকরূপে শিশুকে গড়ে তোলা।

পরিবারে শিশুর অবস্থান

অনেক পরিবারে দেখা যায় সকল সন্তান সমান গুরুত্ব পায় না। স্বাভাবিকভাবে প্রথম বা বড় সন্তানের প্রতি মা বাবা বা অন্যান্যের স্নেহ ভালোবাসা বেশি থাকে। অন্য সন্তানরা যেন এটা বুঝতে না পারে সে ধরনের আচরণ করা উচিত। মনে রাখতে হবে যে, সব শিশুরই পরিবারের কাছে এক রকম চাহিদা রয়েছে। সেদিকে লক্ষ রেখে ছোট বড় সব সন্তানকে সমান চোখে দেখে লালন–পালন করতে হবে।

পুত্র কন্যা ভেদে শিশুর স্থান

ছেলে বা মেয়ে ভেদে পরিবারে সুযোগ সুবিধার তারতম্য দেখা যায়। নিম্নবিত্ত পরিবার রোজগারের আশায় এ ধরনের আচরণ করে। শিক্ষিত পরিবারেও বংশের ধারা অনুযায়ী এ ধরনের দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু দেখা যায় বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে ছেলেমেয়ে উভয়েই পরিবারে নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে। পরিবারের সদস্যদের উচিত পুত্র কন্যা কোনো ভেদাভেদ না করে তাদের মানুষ করা।

বয়স অনুযায়ী শিশুর স্থান

বয়স কম হলেও শিশুর আত্মসম্মানবোধ থাকে। অনেক সময় শিশুরা বুঝবে না মনে করে তাদের সামনে পরিবারের বিরূপ আলোচনা হয়। এতে শিশুরা মন খারাপ করে। বড়দের প্রতি সম্মান হারিয়ে ফেলে। এ ধরনের আলাপ আলোচনা করার সময় শিশুর উপস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। বড় হলে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনায় অংশ নেওয়া প্রয়োজন। এতে নিজেকে পরিবারের প্রয়োজনীয় ব্যক্তি মনে করবে। পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগবে।

শিশুর চাহিদা পূরণ

মা বাবা ছাড়াও পরিবারের সদস্যরা শিশুর চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখেন। শিশুর চাহিদাগুলো নিম্নে বর্ণিত হল :

খাদ্য ও বস্ত্র

ছোটবেলায় শিশু অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকে। শিশুকে সময়মতো খাওয়ানো, শীত, গরম থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় পরানো, বিছানা ভিজালে পাল্টিয়ে দেওয়া ইত্যাদি শিশুর মৌলিক চাহিদা। ছোটবেলায় এ চাহিদাগুলো ঠিকমতো পূরণ হলে পরিবারের লোকজনদের ওপর শিশুর আস্থা গড়ে ওঠে। তাঁদের প্রতি বিশ্বাস জন্মে। বড় হলে শিশুর অন্যের প্রতি আস্থা গঠনের জন্য এ বিশ্বাস প্রয়োজন।

লেখাপড়া

পরিবারই লেখাপড়া শেখানোর প্রাথমিক স্কুল। ছোটবেলায় জানার আগ্রহ বেশি। পরিবারের সদস্যদের উচিত শিশুর প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া। এতে ছেলেমেয়েদের জ্ঞান বাড়ে। লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হয়। শিশুকে সময়মতো স্কুলে পাঠানো অভিভাবকের কর্তব্য। স্কুলের পড়াশোনার তদারক করার দায়িত্বও তাঁদের।

চিকিৎসা

জন্মের পর শিশুদের প্রয়োজনীয় রোগ প্রতিষেধক টিকা, ইনজেকশন দেওয়াতে হবে। শরীর সুস্থ রাখার জন্য খেলাধুলার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। শিশু অসুস্থ হলে সময়মতো রোগের চিকিৎসা করতে হবে।

স্নেহ ভালোবাসা

শিশুকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, কাপড় পরানো ইত্যাদির মধ্যেই বড়দের স্নেহ ভালোবাসার প্রকাশ পায়। কাজগুলো যত্ন ও আন্তরিকতার সাথে করলে শিশুরা আনন্দ পায়, সহযোগিতা করে। পরিবারের সদস্যদের সাথে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছেলেমেয়েদের সাথে স্নেহ মমতা জড়িয়ে কথা বললে তারা বড়দের আদেশ উপদেশ রক্ষা করতে চেষ্টা করে। বড়দের প্রতিও শ্রদ্ধা, ভালোবাসা দেখাতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

চরিত্র গঠন

শিশুর ভালো চরিত্র গঠনের দায়িত্ব পরিবার পরিজনদের ওপর ন্যস্ত। পরিবারের সদস্যদের উচিত শিশুর সামনে আদর্শ চরিত্রের উদাহরণ স্থাপন করা। সত্য কথা বলা, গরিবের প্রতি দয়া দেখানো, অন্যায় প্রতিরোধ করা, ন্যায়নীতি পালন ইত্যাদি গুণাগুণ অর্জন করা শিশুকে শেখাতে হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছোটদের শিষ্টাচার শিক্ষা

মানুষের জীবনে নানা গুণাবলির মধ্যে শিষ্টাচার একটি। মানুষের কথাবার্তায়, চালচলনে যে ভদ্রনম্র ভাব তারই নাম শিষ্টাচার। অর্থাৎ শিষ্ট যে আচার, তাই শিষ্টাচার। শিষ্ট ব্যক্তি সমাজে যথেষ্ট মর্যাদা পায়। সে তার ভদ্র ব্যবহার ও শিষ্টাচারের মাধ্যমে মানুষের মন সহজে জয় করে। শিষ্টাচারের মূল হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই মানুষকে বিনয়ী ও ভদ্র করে তোলে। শিশুদের মুখে মুখে বা বইয়ের জ্ঞানের মাধ্যমে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া যায় না। পরিবারই হল শিষ্টাচার শিক্ষার প্রাথমিক কেন্দ্র। তারপর শিশু যখন স্কুলে যায় সেখানে শিক্ষক ও ওপরের শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ভদ্র আচরণ শেখে। খেলার মাঠে সমবয়সী কোচ বা প্রশিক্ষকের কাছ থেকে শিষ্টাচার শেখে।

শিশুমাত্রই অনুকরণ প্রিয়। পরিবারে মা বাবা ও অন্যরা যদি বড়দের দেখলে সালাম দেন, কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করেন, অতিথি এলে আদর সমাদরের সাথে আপ্যায়ন করেন, শিশুরা এসব আচরণ লক্ষ করে। পরবর্তীতে তারাও তাদের গুরুজনের প্রতি এসব আচরণ প্রকাশ করে। পরিবারের দরিদ্র আত্মীয়স্বজন ও কাজের লোকের প্রতি মা বাবা যদি সদয় হন, তাদের সুখ দুঃখ লাঘবে সচেষ্ট হন, শিশুরা এসব ব্যবহার মনে রাখে। তারাও অন্যের প্রতি দয়ালু হয় ও সদয় আচরণ করে। শিশুদের ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতা থাকে না। মা বাবা ও আত্মীয়পরিজনের আদর্শ অনুসরণ করে শিষ্টাচার শেখে। সাধারণত ভদ্র পরিবারের সন্তান কথাবার্তা, চালচলনে ভদ্র ও নম্র হয়। অন্য কোনো কারণে যদিও বা কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়।

যে সব গুণাবলির মাধ্যমে শিষ্টাচার শেখা যায় সেগুলো আলোচনা করা হল :

বিনয়

পরিবারে ও সমাজে একে অপরের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ করলে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আত্মীয়পরিজনদের সাথে নরম স্বরে কথা বলা, কোনো কারণে কথা না রাখতে পারলে ক্ষমা চাওয়া বিনয়ী আচরণের উদাহরণ। কেউ মনে করেন, তার টাকা পয়সা আছে, তিনি বড়। যারা তার থেকে কম ক্ষমতাশালী তাদের সাথে তিনি যা খুশি তাই আচরণ করলে

তারা সহ্য করবে। এসব আচরণ বিনয়ী মনোভাবের বিপরীত। অর্থ সম্পদে বড় হলে সে যদি বিনয়ের সাথে কথা বলে অন্যের চোখে সে আরও মহান বলে স্বীকৃতি পায়। তবে অতিমাত্রায় বিনয়ী, মানুষের বিরক্তির পাত্র। যেখানে মতামত প্রকাশ করা দরকার সেখানে চুপ থাকা বুদ্ধিহীনতার লক্ষণ। ছেলেমেয়েদের শেখাতে হবে বড়দের কথার জবাব শ্রদ্ধা ও ভক্তিস্বরে দিতে হয়। শিক্ষকদের সাথে নরম স্বরে কথা বলতে হয়। এসব গুণ অর্জনে বিনয়ী হওয়া যায়।

ভদ্রতা

পরিচিত ব্যক্তি দেখলে সালাম দিয়ে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করা ভদ্রতার লক্ষণ। মানুষের সাথে ভদ্র ব্যবহারে পয়সা খরচ হয় না। কিন্তু পরিবারের বন্ধন দৃঢ় করা ও পরিবারের লোকজনের সুনাম বজায় রাখার জন্য ভদ্রতা একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের শেখাতে হয় বাড়িতে অতিথি এলে যথারীতি অভ্যর্থনা জানানো, যাওয়ার সময় এগিয়ে দেওয়া, বড়দের দেখলে জায়গা ছেড়ে দিয়ে বসতে দেওয়া ভদ্র আচরণ। স্কুলেও শিক্ষকের সাথে আদব কায়দা রক্ষা করতে গিয়ে ভদ্রতা শেখার সুযোগ আসে। অভদ্র ব্যক্তি মানুষের কাছে অপ্রিয়।

বিবেচনা বোধ

একত্রে বসবাস করতে গিয়ে সেখানে শুধুমাত্র নিজের সুযোগ সুবিধার কথা ভাবলে স্বার্থপর বলে পরিচিত হয়। অন্যের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করে কাজ করতে হয়। অনেকে আছে নিজের বিনোদনের জন্য খুব জোরে রেডিও ছেড়ে গান শোনে। পাশের ঘরে একজন পরীক্ষার্থী পড়াশোনা করছে সেটা বিবেচনা করে না। অন্যের ক্ষতি করে নিজের স্বার্থ উদ্ধার হোক এই মনোভাব ত্যাগ করা উচিত। একে অন্যের সহযোগিতা করবে। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মাধ্যমে সুখী সংসার গড়ে তুলবে, এটাই সংসার পরিচালনার উদ্দেশ্য হবে। পরিবারের প্রতি সবার অবদান সমান হতে পারে না। কেউ কঠোর পরিশ্রম করতে পারে, কারও মধ্যে কর্মোদ্যমের অভাব থাকে। কারও সহিষ্ণুতা বেশি আবার কেউ কম ধৈর্যশীল, কারও আচরণে অস্বাভাবিকতা থাকে। সুতরাং কাউকে বিচার করতে গেলে উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত। তাহলে কোনো মনোমালিন্য বা পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয় না, দেখা গেছে, সুবিবেচনার অভাবে অনেক মূল্যবান প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

মা বাবা ছাড়াও পরিবারে দাদা দাদি, নানা নানি, চাচা, ফুফু, খালা বা অন্যান্য বয়স্ক আত্মীয় থাকতে পারেন। বয়সের চাপে অথবা অসুস্থতার কারণে অনেকে পারিবারিক কাজ থেকে বিরত থাকেন। এ ধরনের ব্যক্তিদের কোনোক্রমেই পরিবারের বোঝা মনে করা উচিত নয়। এরা পরিবারের সম্মানিত সদস্য, তাদের প্রয়োজনমতো যত্ন তদারক করতে হবে। তাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। বয়স্ক ব্যক্তি কর্মক্ষম হলে সংসারের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। আর্থিক উপার্জন না করলেও গৃহপরিচালনায় তাঁদের অভিজ্ঞ মতামত প্রকাশ করবেন। ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের শেখাতে হবে বয়স্কদের দেখলে সালাম দেওয়া। অবসর সময়ে তাদের কাছে গিয়ে গল্প করা। আদেশ উপদেশ মেনে চলা। বয়স্কদের কাজেকর্মে সাহায্য করা। স্কুলে শিক্ষক দেখলে সালাম দেওয়া। তাঁদের আদেশ উপদেশ মেনে কাজ করা। শিক্ষক ক্লাসে পড়ানোর সময় মনোযোগ দিয়ে শোনা ইত্যাদি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শনের উদাহরণ।

সত্যবাদিতা

ছোট ছেলেমেয়েরা হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য, সদা সত্য কথা বলবে-এ বাক্যটি অনেকবার খাতায় লেখে। লেখাপড়ার মাধ্যমে সত্যবাদিতা শেখানোর চেয়ে কাজকর্ম ও বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে শেখালে বেশি ফলপ্রসূ হবে। পরিবারে মা বাবা অনেক সময় ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে কাজ আদায়ের জন্য এটা ওটা দেবেন বলে কথা দেন। কিন্তু পরে সে কথা আর রক্ষা করেন না। এখান থেকে ছেলেমেয়েরাও শেখে বন্ধুবান্ধবদের ফাঁকি দিতে। তাদের সাথে মিথ্যা কথা বলতে। মা বাবা ও পরিবারের সদস্যদের উচিত ছেলেমেয়েদের সাথে সত্য কথা বলা। কথা দিয়ে কথা রক্ষা করা। কেউ কোন দোষত্রুটি করলে সেটা স্বীকার করা, অগোচরে কোনো জিনিস ব্যবহার করে সেটা সময়মতো জানানো-এসব শিক্ষা ছোটবেলা থেকে দেওয়া উচিত।

সত্য বলা ধর্ম, মিথ্যা বলা মহাপাপ—কথাটি পালন করা সকলের কর্তব্য। সত্যবাদী লোক গরিব হলেও শ্রদ্ধার পাত্র। আর মিথ্যাবাদীকে সবাই ঘৃণা করে। এসব শিক্ষা ছোটবেলা থেকে দিলে মহৎ গুণ সত্যবাদিতা তাদের চরিত্রে স্থাপিত হয়। যেসব পরিবারে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয় সেসব পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সত্যবাদিতার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। স্কুলের কাজকর্মে সত্যবাদিতার জন্য ছেলেমেয়েদের পুরস্কার দেওয়া হলে আর মিথ্যার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকলে ছেলেমেয়েরা সত্যকাজে উৎসাহী থাকে।

ভালো কাজে আগ্রহী

যে কাজ করলে অন্যের প্রশংসা পাওয়া যায়, কাজের ভালো ফল লাভ হয়, কাজ করে আনন্দ পাওয়া যায় সেগুলোই ভালো কাজ। আদর্শ ব্যক্তির জীবনে ভালো কাজের অনেক উদাহরণ আছে। যেমন–বিপদে মানুষকে সাহায্য করা, গরিবের প্রতি দয়া দেখানো, ঘরের কাজে পরিবারের সদস্যদের সাহায্য করা, ঘর ও বাইরের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই এসব কাজের প্রতি আগ্রহ জাগাতে হবে। মা বাবা, আত্মীয়স্বজনকে ভালো কাজ করতে দেখলে ছেলেমেয়েরা তাদের অনুসরণ করে। পরবর্তীতে এসব কাজ করতে আগ্রহ দেখায়। ঘরে ও বাইরে ভালো কাজের জন্য যদি প্রশংসা ও পুরস্কার পায়, ভালো কাজ করার প্রতি ছেলেমেয়েদের আগ্রহ বেড়ে যায়। যেমন স্কুলে ভালো পাসের জন্য মেডেল, সার্টিফিকেট পেলে পরবর্তীতে ভালো করার জন্য উৎসাহ ও চেষ্টা বেড়ে যায়। পাশাপাশি মন্দ কাজগুলো কী সেটাও ছেলেমেয়েদের জানা দরকার। মিথ্যা বলা, মানুষকে ফাঁকি দেওয়া, অন্যের জিনিস নষ্ট করা, মানুষকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি মন্দ কাজ। ছোটবেলা থেকে ভালোমন্দ বিচার করতে শেখা উচিত। শৈশবে দলেবলে কোনো ভালো কাজ করার আনন্দ থেকেই সে কাজের প্রতি স্থায়ী আগ্রহ জন্মে। যেমন–পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাগান করা একটি ভালো কাজের অভিজ্ঞতা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে সাধারণত কত ধরনের পরিবার দেখতে পাওয়া যায়–
   ক. এক   খ. দুই
   গ. তিন   ঘ. চার

২. পরিবারের ছেলেমেয়েরা কাকে অনুসরণ করে?
   ক. মাতা পিতা   খ. দাদা দাদি
   গ. চাচা চাচি   ঘ. আত্মীয়–স্বজন

৩. সমাজ গড়ে ওঠে–
   ক. পরিবার, গোত্র, সম্প্রদায় নিয়ে   খ. ছেলেমেয়ে আত্মীয়–পরিজন নিয়ে
   গ. স্কুল, কলেজ, বাজার নিয়ে   ঘ. মা বাবা, ভাইবোন নিয়ে

৪. শিষ্টাচার শিক্ষার প্রাথমিক কেন্দ্র–
   ক. স্কুল   খ. কলেজ
   গ. পরিবার   ঘ. মসজিদ

৫. আদর্শ পরিবারের বৈশিষ্ট্য হল–
   i. নির্দিষ্ট সদস্য সংখ্যা
   ii. আয়ের সংস্থান
   iii. নির্দিষ্ট বাসস্থান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ থেকে ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

শাওন তার বাবা মা চাচা চাচি দাদা দাদির সাথে একই পরিবারে বাস করে। পরিবারে তার দাদা গৃহ পরিচালনা করেন।

৬. পরিবারের বৈশিষ্ট্য হল–

i. বংশ বৃদ্ধি, নির্দিষ্ট সদস্য সংখ্যা
ii. একত্রে বসবাস ও শিশু লালন–পালন
iii. ধর্মমত ও রুচির মিল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৭. শাওন কোন ধরনের পরিবারে বাস করে?

ক. একক পরিবারে।
খ. যৌথ পরিবারে।
গ. পিতৃ–প্রধান পরিবারে।
ঘ. মাতৃ–প্রধান পরিবারে।

৮. শাওনের পরিবারে কে প্রধান ব্যক্তি–

ক. দাদা।
খ. দাদি।
গ. বাবা।
ঘ. মা।

সৃজনশীল প্রশ্ন

আবির পরিবারের আদরের একমাত্র ছেলে। পিতা মাতা নির্দ্বিধায় তার সকল আবদার পূরণ করে। কখনও তার আবদার পূরণ করতে অপারগ হলে সে জিনিসপত্র ভাঙচুর করে এবং কাজের বুয়াকে মারধর করে।

ক. পরিবার কাকে বলে?
খ. শিশুদের কীভাবে সৎ কাজে উৎসাহিত করা যায় বর্ণনা কর।
গ. আবির বয়স্কদের প্রতি কীভাবে সম্মান দেখায় বর্ণনা কর।
ঘ. আবিরের চাহিদা পূরণে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর?

২. সখিনা একজন গ্রাম্য বধূ। সমাজের অন্য কারো সাথে তাদের পরিবারের কোনো যোগাযোগ নেই। হঠাৎ করে একদিন তার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসহায় সখিনা তখন প্রতিবেশীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে।

ক. সমাজের সংজ্ঞা দাও।
খ. সমাজ ও পরিবারের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা কর।
গ. অসহায় সখিনার এই দুঃসময়ে আত্মীয়–স্বজনের কিরূপ মনোভাব পোষণ করা উচিত বলে তুমি মনে কর।
ঘ. সখিনাকে কেন আত্মীয়–স্বজনের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হচ্ছে— ব্যাখ্যা কর।

৩. মাহিয়ার বাবা একজন দরিদ্র কৃষক। শত কষ্টেও তিনি মাহিয়ার লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। গ্রামের সকলের প্রয়োজনে তিনি সর্বদা সাহায্য সহযোগিতা করেন। ফলে তিনি গ্রামের সকলের প্রিয়। অন্য দিকে ভালো ছাত্রী বলে মাহিয়া ভীষণ অহংকারী এবং তার আচরণে শিষ্টাচারের অভাব। তাই এই আচরণের কারণে তার প্রতি অনেকেই বিরক্ত।

ক. শিষ্টাচার কী?
খ. মাহিয়ার বাবা সকলের প্রিয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. মাহিয়া কীভাবে সকলের প্রিয় হতে পারে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মাহিয়ার বাবা ও মাহিয়ার তুলনামূলক আচরণ বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

খাদ্য গ্রহণে দেহের পুষ্টি হয় ও স্বাস্থ্য ভালো থাকে। দেহের চাহিদামতো পুষ্টিকর খাবার না খেলে মানুষ অপুষ্টির শিকার হয়। অপুষ্টির কারণে নানা রোগে আক্রান্ত হয়। এজন্য খাদ্য এবং পুষ্টি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান থাকা দরকার।

খাদ্য

বেঁচে থাকার জন্য সব প্রাণীরই খাদ্যের প্রয়োজন। মানবদেহের ভিতরের ও বাইরের কাজগুলো সঠিকভাবে চালিয়ে নেওয়ার জন্য দরকার শক্তি। এই শক্তি ভাত, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, সবজি, ফল, তেল, চিনি এসব খাদ্য থেকে পাওয়া যায়। যেসব দ্রব্য গ্রহণ করলে দেহের গঠন, বৃদ্ধি সাধন, কর্মশক্তি উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং দেহ সুস্থ থাকে তাকেই খাদ্য বলে।

পুষ্টি কী

পুষ্টি দেহের অভ্যন্তরে একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু আহার করার পর পরিপাক ও পরিশোধিত হয়, পরে বিভিন্ন কোষে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, কর্মশক্তি উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে তাকে পুষ্টি বলে। পুষ্টি মানুষের স্বাস্থ্য ও খাদ্য সম্পর্কিত বিষয়।

খাদ্যের সাথে পুষ্টির সম্পর্ক

খাদ্যের সাথে পুষ্টির সম্পর্ক নিবিড়। অনেকে পেট ভরে তিনবেলা আহার করে। তবুও পুষ্টির অভাবে নানারকম অসুস্থতায় ভোগে। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে দেহের পুষ্টি সাধিত হয়। কোন খাদ্যে কী উপাদান আছে, দেহে খাদ্যের কী কাজ, প্রয়োজন অনুযায়ী কী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে অপুষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

ক্ষুধা পেলে দামি খাবার খেয়ে পেট ভরলেই পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয় না। কম দামি খাবারেও অনেক পুষ্টি উপাদান আছে। যেমন-মলা, ঢেলা মাছ, ডাল, শাকসবজি, গুড় ইত্যাদি। সঠিক খাদ্য গ্রহণের পদ্ধতি জানা থাকলে কম খরচেও পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

খাদ্যের সাথে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক

স্বাস্থ্য বলতে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাকেই বোঝায়। খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং মানসিক অবস্থা নিবিড়ভাবে জড়িত। একজন মানুষের মধ্যে যদি এ চারটি শর্ত সঠিকভাবে উপস্থিত থাকে তবেই স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। সুস্বাস্থ্য অর্জন করতে হলে দরকার সুষম খাবার, নিয়মিত ব্যায়াম, ঘুম, বিশ্রাম ও মুক্ত আলো–বাতাস গ্রহণ। বাড়ি ঘরের পরিচ্ছন্নতা, বন্ধু বান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানও সুস্বাস্থ্য রক্ষার সহায়ক। খাদ্য ভালোভাবে হজম হলে, দেহমনের অবস্থা ভালো থাকলে দেহে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকলে, স্বাস্থ্য ভালো বলা হয়। বয়স অনুযায়ী স্বাভাবিক ওজন, মসৃণ ত্বক, কালিমাবিহীন চোখ, উন্নত ও সাবলীল দেহভঙ্গি, খাওয়ায় রুচি, নিয়মিত মলমূত্র ত্যাগ এবং নিয়মিত ঘুম ভালো স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

মানবদেহে খাদ্যের কাজ

১। দেহ গঠন, বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণ
২। তাপ উৎপাদন ও কর্মশক্তি প্রদান
৩। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন

দেহের গঠন, বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণ

একটি শিশু যে ওজন, উচ্চতা নিয়ে জন্মায় ক্রমে ক্রমে তা বৃদ্ধি পায়। নবজাতক শিশুর হাড় নরম থাকে, মাংসপেশি কম থাকে। নখ, চোখ, নাক, ফুসফুস, বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড, পরিপাকতন্ত্র ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আকারে ছোট ও নমনীয় থাকে। উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে ধীরে ধীরে শিশুর দেহে রক্ত, মাংস ও চামড়ার পরিমাণ বাড়ে, হাড় মজবুত হয়, আকারে বৃদ্ধি পায় এবং শক্তি অর্জন করে। ১৮ বছর পর্যন্ত মানবদেহে এসব গঠন ও বৃদ্ধির কাজ চলে।

দৈনন্দিন কাজকর্ম, যেমন–চলাফেরা, খেলাধুলা, সংসারের কাজকর্ম ও মাংসপেশি সঞ্চালনের ফলে দেহ ক্ষয় হয়। মানুষ ঘুমিয়ে থাকলেও দেহের অভ্যন্তরে পরিপাক, রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাসকার্য চলে। কাজ করার ফলে দেহের ক্ষয় হয়। মাংস, ডিম, দুধ, ডাল ইত্যাদি খাদ্য দ্বারাই দেহের গঠন, বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণ হয়। কিছু খনিজ লবণ ও ভিটামিন এসব কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তাপ উৎপাদন ও কর্মশক্তি প্রদান

মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি চালানোর জন্য দরকার হয় কয়লা, ডিজেল, পেট্রোল। এগুলো পুড়ে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হয়। এই শক্তি দ্বারাই মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি চলে।

মানবদেহকে ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করা যায়। দেহের কাজগুলো করার জন্য দরকার শক্তি। খাদ্যের কাজ হল এই শক্তি যোগান। তেল, ঘি, মাখন, চাল, আটা, চিনি, গুড় এসব খাদ্য আমাদের দেহে তাপশক্তি উৎপন্ন করে। দেহের এই তাপশক্তি কর্মশক্তিতে পরিণত হয় এবং কাজ করার ক্ষমতা সৃষ্টি করে।

দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন

দীর্ঘদিন দেহে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হলে চক্ষুরোগ, চামড়ার রোগ, রিকেট, বেরিবেরি, রক্তশূন্যতা, গলগণ্ড ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়। খাদ্য আমাদের দেহে অ্যান্টিবডি তৈরি করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। আবার পর্যাপ্ত ও পরিমিত খাদ্যের অভাবে দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন মানুষ নানারকম সংক্রামক রোগে সহজে আক্রান্ত হয়। শাকসবজি, ফলমূল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ এসব খাদ্যের কাজ দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

খাদ্য উপাদানসমূহ

সব খাদ্যই বিভিন্ন উপাদান দ্বারা গঠিত। খাদ্যের উপাদান ৬টি-

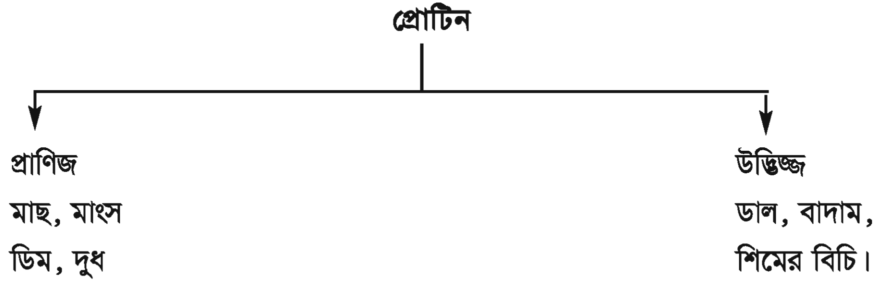
১। প্রোটিন
২। কার্বোহাইড্রেট
৩। স্নেহ পদার্থ
৪। ভিটামিন
৫। খনিজ লবণ
৬। পানি

সব খাদ্যে এই উপাদানগুলো সমান পরিমাণে থাকে না। কোনো খাদ্যে একটি বা দুটি উপাদান বেশি পরিমাণে থাকে। আবার কোনো খাদ্যে একটিমাত্র উপাদান থাকে। যেমন–চিনি কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ এবং তেল স্নেহ পদার্থ সমৃদ্ধ খাদ্য। এ কারণে সব ধরনের খাদ্য গ্রহণে দেহ সুস্থ থাকে।

প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি দেহ গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণকারী উপাদান। স্নেহ পদার্থ, কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন তাপ ও কর্মশক্তি উৎপাদনকারী উপাদান। ভিটামিন, খনিজ লবণ, প্রোটিন ও পানি রোগ প্রতিরোধকারী উপাদান।

প্রোটিন

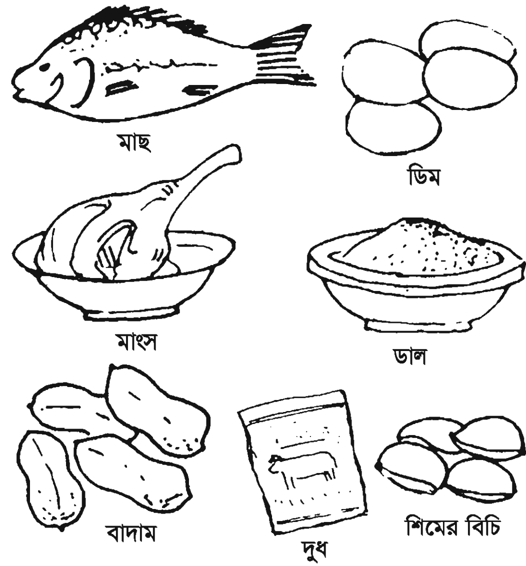
প্রোটিন খাদ্যের একটি উপাদান। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ থেকে যে প্রোটিন পাওয়া যায় তা প্রাণিজ প্রোটিন। ডাল, বাদাম, শিম, বরবটি, ছোলা, মটরশুঁটির বিচি উদ্ভিজ্জ প্রোটিন। সুতরাং উৎস অনুযায়ী প্রোটিনকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।



খাওয়ার পরে খাদ্যের প্রোটিন পরিপাক হয়ে ভেঙে অ্যামাইনো এসিড হয়। অ্যামাইনো এসিড ২০ প্রকার। এর মধ্যে ১০ প্রকার অ্যামাইনো এসিড শিশুদের দেহের গঠন ও বৃদ্ধির জন্য বেশি প্রয়োজন হয়। এ সকল প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড প্রাণিজ প্রোটিনে পাওয়া যায়। তাই গুণে ও মানে প্রাণিজ প্রোটিন উদ্ভিজ্জ প্রোটিন থেকে বেশি ভালো।

দেহের পেশি, ত্বক, রক্ত, স্নায়ু, হাড় ইত্যাদির কোষ, কলা প্রোটিন দিয়ে তৈরি। কাজকর্ম করে দেহের যে ক্ষয় হয়, প্রোটিন সে ক্ষয় পূরণ করে। প্রোটিন দেহে অ্যান্টিবডি তৈরি করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে।

শিশুর খাদ্যে প্রাণিজ প্রোটিন কম থাকলে দেহের গঠন ও বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না, ওজন কমে যায়, হাড্ডিসার হয়, ডায়রিয়া হয়, মেজাজ খিটখিটে হয়, বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না।



প্রোটিন জাতীয় খাদ্য

কার্বোহাইড্রেট

এটি শক্তি প্রদানকারী উপাদান। চাল, গম, ভুট্টা, আলু, চিনি, গুড়, মধু, কাঁচা এবং পাকা ফল ও সবজি থেকে কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায়। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। আমাদের দেশে শতকরা ৮০ ভাগ লোকই ভাত, রুটি, আলু, চিড়া, মুড়ি, খই, ইত্যাদি খাদ্য থেকে শক্তির চাহিদা পূরণ করে।

চাল, গম, আলু, কাঁচা ফল ও সবজির কার্বোহাইড্রেটের নাম স্টার্চ বা শ্বেতসার। ভাত, রুটি ইত্যাদি খাওয়ার পরে শ্বেতসার পরিপাক হয়ে ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হয়। শাকসবজি ও ফলের আঁশও একপ্রকার কার্বোহাইড্রেট, নাম সেলুলোজ।

শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের প্রধান কাজ দেহে তাপ উৎপাদন করে কর্মশক্তি যোগানো। চিনি, গুড়, মধু ও ফলের রস খাদ্যের স্বাদ বাড়ায়। খাদ্যের সেলুলোজ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

দীর্ঘদিন মানুষের দেহে কার্বোহাইড্রেটের অভাব হলে ওজন কমে যায়। কর্মশক্তি হারিয়ে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে।



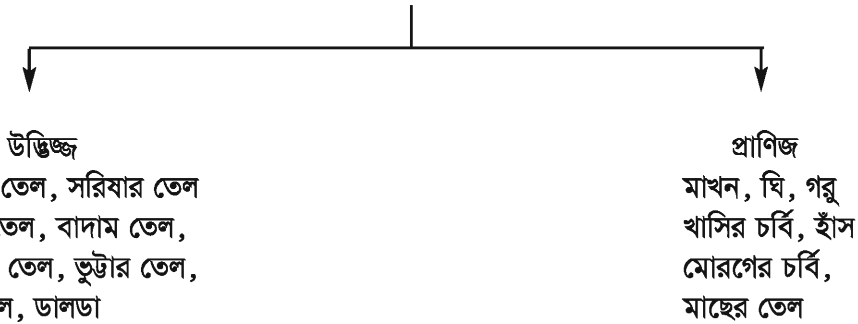
কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট গ্রহণে দেহে চর্বি বা মেদ জমে ওজন বেড়ে যায়। অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি পাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

স্নেহ পদার্থ

খাদ্যের ছয়টি উপাদানের মধ্যে স্নেহ পদার্থ একটি। যে খাদ্যে স্নেহ পদার্থ থাকে তাকে স্নেহজাতীয় খাদ্য বলা হয়। ভোজ্য তেল, ঘি, মাখন, ডালডা, চর্বি স্নেহজাতীয় খাদ্য।
স্নেহজাতীয় খাদ্য তরল এবং জমানো অবস্থায় থাকে। প্রাণিজ এবং উদ্ভিজ্জ উভয় উৎস থেকে স্নেহজাতীয় খাদ্য পাওয়া যায়।

স্নেহজাতীয় খাদ্য



স্নেহ পদার্থের প্রধান কাজ দেহে তাপ উৎপন্ন করে শরীরের তাপ ঠিক রাখা এবং কাজ করার শক্তি দেওয়া। খাদ্যের স্বাদ উন্নত করা। শিশুদের চর্মরোগ থেকে রক্ষা করা।
স্নেহজাতীয় খাদ্য বেশি খেলে শরীরে মেদ জমে ওজন বেড়ে যায়। অতিরিক্ত মোটা হলে বয়স্ক ব্যক্তির নানা রোগ হয়।
কিলোক্যালরি–খাদ্য থেকে উৎপন্ন তাপমাত্রার একক কিলোক্যালরি। এক গ্রাম স্নেহ পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয় ৯ কিলোক্যালরি তাপ। এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট ও এক গ্রাম প্রোটিন, প্রতিটি থেকে উৎপন্ন হয় ৪ কিলোক্যালরি তাপ।



স্নেহজাতীয় খাদ্য

ভিটামিন

দেহের পুষ্টির জন্য ভিটামিন অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে ভিটামিন পাওয়া যায়। লবণ, চিনি যেমন পানিতে গলে পানির সাথে মিশে যায়, কতক ভিটামিন আবার চর্বিতে গলে চর্বির সাথে মিশে যায়।

মিশে যাওয়া বা দ্রবণ গুণ অনুসারে ভিটামিন দুই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত :
১। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন—ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন সি।
২। চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন—ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই ও ভিটামিন কে।

চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন– যেসব ভিটামিন সহজে চর্বিতে গলে মিশে যায় সেগুলো চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন। যেমন– ভিটামিন এ, ডি, ই ও কে। যেসব খাদ্যে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন থাকে সে সব খাদ্য ঢাকনা ছাড়া পাত্রে অল্প তেলে ভাজি করলে তেলের সাথে মিশে বাতাসে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। ডুবো তেল বা ঢাকনাযুক্ত পাত্রে ভাজি করলে ভিটামিনের অপচয় কম হয়।

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন– যেসব ভিটামিন সহজেই পানিতে গলে মিশে যায় সেগুলো পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন। যেমন–ভিটামিন বি ও সি। ভিটামিন বি ও ভিটামিন সি জাতীয় খাদ্য কেটে পানিতে ডুবিয়ে ধুয়ে পানি ফেলে দিলে অথবা সিদ্ধ করে পানি ফেলে দিলে ভিটামিনের অনেক অপচয় হয়।

ভিটামিন এ

দেহ সুস্থ থাকার জন্য ভিটামিন ‘এ’ দরকার। ভিটামিন ‘এ’ দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

প্রাণিজ উৎস-মাছের কলিজা, মাথাসহ মলা–ঢেলা মাছ, চর্বিযুক্ত মাংস, ডিমের কুসুম, মাখন, ঘি, দুধ ইত্যাদিতে ভিটামিন ‘এ’ আছে।

উদ্ভিজ্জ উৎসের মধ্যে আছে হলুদ, সবুজ, লাল বর্ণের শাক সবজি। যেমন–কচুশাক, লালশাক, পুঁইশাক, বথুয়াশাক, গাজর, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি। দেশীয় রঙিন ফল যেমন–আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ভিটামিন–এ এর ভাল উৎস।

দেহে ভিটামিন–‘এ’ চোখ ও চামড়ার সুস্থতা বজায় রাখে। দাঁত ও হাড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

দেহে ভিটামিন–‘এ’ এর অভাবে চোখের জ্যোতি কমে যায়। রাতকানা এবং চক্ষুশুষ্কতা রোগ হয়, অকালে অন্ধ হয়ে যায়।



ভিটামিন এ জাতীয় খাদ্য

ভিটামিন ডি

এটি চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন। প্রাণিজ খাদ্যে ভিটামিন ডি বেশি পাওয়া যায়।

কড, শার্ক, হেলিবার্ট ইত্যাদি সামুদ্রিক মাছের তেল, মাছের কলিজা, ডিম, দুধ ও দুধের তৈরি খাদ্য থেকে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়।

রোদে জন্মানো শাকসবজিতে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। যে সব গরু, ছাগল রোদে চড়ে ঘাস খায় সেসব প্রাণীর দুধে ভিটামিন ডি থাকে। সূর্যের আলো ত্বকের ওপর পড়লে দেহে ভিটামিন ডি তৈরি হয়। শিশুদের গোসলের আগে তেল মাখিয়ে কিছুক্ষণ রোদে রাখলে দেহে ভিটামিন ডি তৈরি হয়। এতে শিশুর দেহের হাড় মজবুত হয়।

ভিটামিন ডি দাঁত ও হাড়ের স্বাভাবিক গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ভিটামিন ডি–এর অভাবে শিশুর দেহের হাড় বেঁকে যায়। বুকের পাঁজর সামনের দিকে বের হয়ে আসে। পায়ের হাড় বেঁকে যায়। মাথার খুলি বাক্সের মতো চারকোণা আকৃতি হয়। এ অবস্থাকে রিকেট বলে। রিকেটে আক্রান্ত হলে শিশুরা দেরিতে হাঁটে।



ভিটামিন ডি জাতীয় খাদ্য

বয়স্কদের ভিটামিন ডি–এর অভাবে হাড় দুর্বল হয়ে ভঙ্গুর হয়ে যায়। হাঁটাচলায় অসুবিধা হয়। মহিলাদের কোমরে ব্যথা হয়।

ভিটামিন ই ও কে

সবুজ শাকসবজি, মটরশুঁটি, অঙ্কুরিত ছোলা, সয়াবিন, ডিমের কুসুম, যকৃৎ, দুধ ইত্যাদি খাদ্যে ভিটামিন ই পাওয়া যায়।

পালংশাক, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, সয়াবিন, সামুদ্রিক মাছ, ডিম, দুধ, যকৃৎ ইত্যাদি খাদ্যে ভিটামিন কে পাওয়া যায়।

ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স

কয়েক প্রকার ভিটামিনকে একত্রে ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স বলা হয়। বি–কমপ্লেক্সের মধ্যে ভিটামিন বি১, বা থায়ামিন, ভিটামিন বি২ বা রাইবোফ্লাভিন, নায়াসিন এবং ফলিক এসিড উল্লেখযোগ্য। যেসব খাদ্য থেকে এই ভিটামিনসমূহ পাওয়া যায় সেগুলো–দুধ, পনির, ডিম, কলিজা, মাংস, ডাল, শিমের বিচি, সবুজ শাকসবজি, ফল, ঢেঁকিছাঁটা সিদ্ধ চাল, আটা ইত্যাদি।

ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স চোখ, দেহ, ত্বক ও স্নায়ুর কোষ ও কলাসমূহ সুস্থ রাখে।

দেহে ভিটামিন বি–কমপ্লেক্সের অভাবে ঠোঁটের কোনায় ঘা হয়। জিহ্বায় ফুসকুড়ি পড়ে। খাদ্য পরিপাকে অসুবিধা হয়। খাওয়ায় অরুচি হয়। মানসিক ক্লান্তি দেখা দেয়। থায়ামিনের অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়। কলেছাঁটা চাল ও ভুষি ছাড়ানো আটা ও মাড় ফেলে রান্না করা ভাত একনাগাড়ে অনেকদিন ধরে খেলে এই রোগ হয়। চালের লাল আবরণ ও গমের ওপরের অংশে থায়ামিন থাকে।



ভিটামিন বি জাতীয় খাদ্য

ভিটামিন সি

এটি পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন। দেহের কোথাও কেটে গেলে বা ক্ষত হলে ভিটামিন সি ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে। দেহে ভিটামিন সি–এর অভাব হলে দেরিতে ঘা শুকায়। ভিটামিন সি দাঁতের মাড়ি সুস্থ রাখে। ধারণা করা হয় ভিটামিন সি এর জন্য দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠিক থাকে।

আমলকী, আমড়া, পেয়ারা, লেবু, বাতাবিলেবু, কামরাঙা, আনারস, কমলা, ফুলকপি, সবুজ শাকসবজি, কাঁচামরিচ ইত্যাদি থেকে ভিটামিন সি পাওয়া যায়।

টাটকা সবজি ও ফলে ভিটামিন সি–এর পরিমাণ বেশি থাকে। উচ্চ তাপে ও আলোবাতাসে ভিটামিন সি সহজে নষ্ট হয়ে যায়। শাকসবজি ও ফল কেটে ধুয়ে পানি ফেলে দিলে ভিটামিন সি পানিতে গলে বেরিয়ে যায়। শাকসবজি সিদ্ধ করে পানি ফেলে দিলে ভিটামিন সি–এর অপচয় হয়। দীর্ঘদিন গুদামজাত করে রাখলে ফল ও খাদ্যের ভিটামিন সি কমে যায়।

ভিটামিন সি স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে দাঁত, মাড়ি ও পেশি মজবুত করে। সর্দি কাশি নিরাময় করে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে।

খনিজ লবণ

খাদ্যে কয়েকটি খনিজ উপাদান আছে। সেগুলো দেহে রাসায়নিক লবণরূপে থাকে। সেজন্য সেসব উপাদান খনিজ লবণ নামে পরিচিত। খনিজ লবণ কয়েক প্রকারের। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহা, আয়োডিন এ খনিজ লবণগুলো দেহের পুষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়াও সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরিন, ফ্লোরিন, তামা, দস্তা ইত্যাদি দেহের জন্য প্রয়োজন। খনিজ লবণ দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ঠিক রেখে শারীরবৃত্তীয় কাজ সচল রাখে। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা দাঁত, হাড়, রক্তকোষ ও গ্রন্থির সুরক্ষার জন্য খনিজ লবণ প্রয়োজন।

ক্যালসিয়াম

কাঁটাসহ ছোট মাছ, দুধ, দই, ছানা, পনির, সবুজ শাক, ছোলা, সয়াবিন ও শস্যদানার আবরণে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়।

ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি একত্রে শিশুর দেহের হাড় ও দাঁত গঠনের কাজ করে। এর অভাবে রিকেট রোগ হয়।

ফসফরাস

দুধ, দই, ডিম, মাংস, নরম কাঁটাযুক্ত ছোট মাছ, সয়াবিন, ডাল, পালংশাক, মুলা, গাজর, শসা, ফুলকপি ইত্যাদি খাদ্যে ফসফরাস পাওয়া যায়। দেহকোষের গঠনের জন্য ফসফরাস প্রয়োজন।

ফসফরাস, ক্যালসিয়ামের মতো দাঁত, নখ, চুল ও দেহের হাড় গঠন করে।



ক্যালসিয়াম জাতীয় খাদ্য



ফসফরাস জাতীয় খাদ্য

লোহা

ডিমের কুসুম, কলিজা, রঙিন শাক, ঝোলাগুড়, দানা শস্য ইত্যাদি খাদ্যে লোহা পাওয়া যায়।

লোহা রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরি করে। দেহকোষ গঠন করে। দেহে লোহার অভাব হলে রক্তে হিমোগ্লোবিন কমে যায়, অ্যানিমিয়া রোগ হয়। এতে খাওয়ায় অরুচি হয়। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। শরীরে পানি আসে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। শিশু, মহিলা, পুরুষ সবাই লোহার অভাবজনিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে।


ডিমের কুসুম


কলিজা


রঙিন শাক

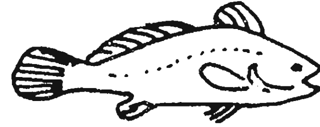

ঝোলা গুড়

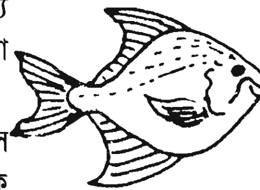
লোহা জাতীয় খাদ্য

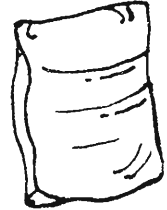
আয়োডিন

দেহের পুষ্টির জন্য আয়োডিন অত্যাবশ্যক। আয়োডিনের অভাব হলে নানা রকম দৈহিক ত্রুটি দেখা যায়। আয়োডিনের অভাবে গলা ফুলে গলগন্ড বা ঘ্যাগ রোগ হয়। আহারে পরিমিত পরিমাণ আয়োডিন দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন। আয়োডিনের অভাবে মানসিক দুর্বলতা ও জড়তা আসে। সন্তান–সম্ভবা মায়ের খাদ্যে আয়োডিনের অভাব থাকলে শিশু জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। প্রতিবন্ধী শিশু ও গলগন্ড রোগ বাংলাদেশে আশংকাজনকভাবে বাড়ছে। প্রতিরোধের জন্য আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া অতি আবশ্যক। সব খাদ্যে আয়োডিন পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের কাছে যেসব এলাকার মাটিতে ও পানিতে আয়োডিন থাকে সে অঞ্চলে উৎপন্ন শাকসবজি ও মাছে আয়োডিন পাওয়া যায়। সামুদ্রিক শ্যাওলা ও মাছ আয়োডিনের ভাল উৎস।


পোয়া মাছ


রূপচাঁন্দা


আয়োডিন লবণ

আয়োডিন জাতীয় খাদ্য

পানি

দেহের ওজনের শতকরা ৭০ ভাগই পানি। এ পানি রক্ত, মাংস, হাড়, ত্বক, দাঁত, নখ ইত্যাদি কোষের ভিতরে ও বাইরে থাকে। দৈনিক ৬–৮ গ্লাস বিশুদ্ধ পানি পান করা উচিত। শাকসবজি, ফলমূল অন্যান্য তরল খাদ্য দিয়ে পানির চাহিদা পূরণ করা যায়।

পানি খাদ্য পরিপাক ও শোষণে সহায়তা করে। দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। রক্তের তরলতা বজায় রাখে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। দেহের দূষিত পদার্থ ঘাম ও মলমূত্রের সাহায্যে বের করে দেয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিত্যব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যমূল্য

বাংলাদেশের মানুষ দৈনন্দিন আহারে যেসব খাদ্য গ্রহণ করে সেগুলো হলঃ

— চাল, গম, ভুট্টা, আলু

— শাকসবজি, ফল

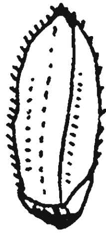
— মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, শুঁটিবীজ ও চিনাবাদাম।

এসব বিভিন্ন খাদ্য থেকে বিভিন্ন উপাদান পাওয়া যায়। কোন খাদ্যে কী উপাদান পাওয়া যায় তা জানা দরকার। যে খাদ্যে কোনো একটি উপাদান বেশি থাকে তাকে সে উপাদান জাতীয় খাদ্য বলা হয়। যেমন মাছ প্রোটিন জাতীয়, চাল শ্বেতসার জাতীয় এবং শাকসবজি ভিটামিন জাতীয় খাদ্য।

চাল

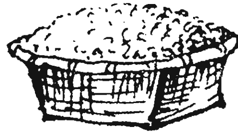
বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য চাল। চাল থেকে আমরা সবচেয়ে বেশি শক্তি পাই। চালের শতকরা ৭৬ ভাগই শ্বেতসার। অন্যান্য উপাদান প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, খনিজ লবণ ও ভিটামিন। ঢেঁকিছাঁটা চালের লাল আবরণে ভিটামিন পাওয়া যায়। সিদ্ধ চালের চেয়ে আতপ চাল বেশি পুষ্টিকর। মাড় ফেলে ভাত রান্না করলে পুষ্টি উপাদানের অপচয় হয়। সেজন্য মাড় না ফেলে রান্না করা উচিত।

চাল থেকে তৈরি মুড়ি, চিঁড়া, খই নাশতায় পরিবেশনের উপযোগী খাবার। চালের গুঁড়া দিয়ে নানারকম পিঠা তৈরি করা হয়।


ধান


ভাত


চাল

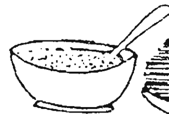

খই

চালের তৈরি খাবার



গম


নুডলস


সুজি


সেমাই

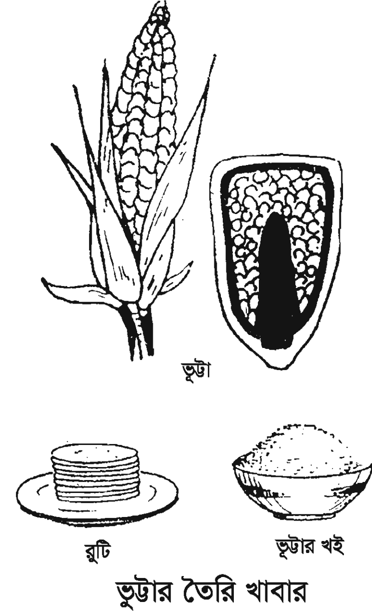
গমের তৈরি খাবার

গম

গম শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। গম ভাঙিয়ে আটা, ময়দা ও সুজি পাওয়া যায়। প্রোটিন, স্নেহ পদার্থ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ইত্যাদি পুষ্টি উপাদান গমে পাওয়া যায়। গমের সম্পূর্ণ অংশ ভাঙিয়ে আটা তৈরি করা হয়। ময়দা ও সুজি তৈরি হয় গমের ভিতরের অংশ থেকে। ময়দা অপেক্ষা আটার পুষ্টিমান বেশি।

আটা, ময়দা ও সুজি দিয়ে রুটি, বিস্কুট, সেমাই, নুডলস ইত্যাদি খাদ্য তৈরি হয়। গমের গুঁড়ার সাথে ডাল, মাংস মিশিয়ে হালিম রান্না হয়। শিশুদের জন্য সুজির হালুয়া পুষ্টিকর খাদ্য।

ভুট্টা

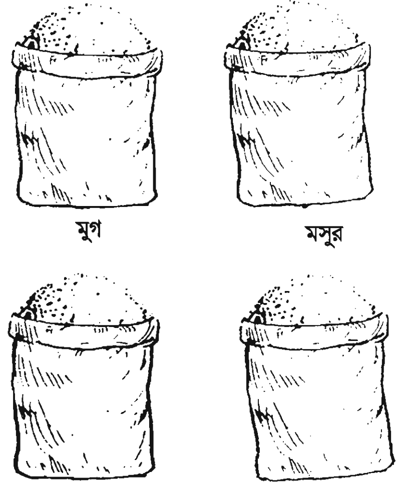


ভুট্টার তৈরি খাবার

হলুদ বর্ণের দানা জাতীয় শস্য। পুষ্টিমানের দিক থেকে ভুট্টা গমের মতোই। বাংলাদেশে অল্প পরিমাণে চাষ হয়। ভুট্টা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য।

ভুট্টায় স্নেহপদার্থ ও প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকায় চাল, গমের মতোই খাদ্যশক্তি দেয়। এতে শ্বেতসার ও অল্প পরিমাণে খনিজ লবণ এবং ভিটামিন আছে। কচি ভুট্টা সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। স্যুপ তৈরিতে কচিভুট্টা সিদ্ধ করে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে পরিপক্ব ভুট্টা ঝলসিয়ে খাওয়ার প্রচলন বেশি। ভুট্টা থেকে খই হয়। ভুট্টার ময়দা দিয়ে রুটি, বিস্কুট, কেক ইত্যাদি তৈরি করা হচ্ছে। দেহে তাপ ও কর্মশক্তি উৎপাদনে ভুট্টার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ডাল



বিভিন্ন জাতের ডাল

বাংলাদেশে মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, মাষকলাই, খেসারি ও অড়হর ডালের চাষ হয়। ডালে চাল, গম অপেক্ষা প্রোটিনের পরিমাণ বেশি। এজন্য ডালকে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য বলা হয়। ডালে শ্বেতসার, ভিটামিন ও লোহা থাকে। কয়েক প্রকার ডাল মিশিয়ে রান্না করলে প্রোটিনের মান বৃদ্ধি পায়। প্রাণিজ প্রোটিনের অত্যধিক মূল্যের কারণে অধিকাংশ লোকই ডাল এবং ছোট মাছ দিয়ে প্রোটিনের চাহিদা মেটায়। ডাল ঠিকমতো সিদ্ধ করে খেলে শরীরে ভালোভাবে কাজে লাগে। গুঁড়া ডাল সহজে সিদ্ধ হয়। ডাল দিয়ে বড়া, বেগুনি, হালুয়া, পিঠা, চটপটি ইত্যাদি খাবার তৈরি করা যায়।

শুঁটিবীজ

শুঁটির শুকনো বিচিকে শুঁটিবীজ বলা হয়। মটরশুঁটি বিভিন্ন জাতের শিমের বিচি, সয়াবিন, মটর ডাল, শুঁটি বীজের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রোটিনের ভালো উৎস। ডালের মতো শুঁটিবীজে ভিটামিন, খনিজ লবণ, স্নেহ পদার্থ ও শ্বেতসার থাকে। অন্য সবজি বা মাছ মাংসের সাথে রান্না করে খেলে পুষ্টিমান বৃদ্ধি পায়।

চিনাবাদাম

উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের ভালো উৎস। দেহের বৃদ্ধির সময় ভাজা চিনাবাদাম শিশুদের জন্য ভালো খাবার। চিনাবাদামে স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন ও অল্প পরিমাণে খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। চিনাবাদামে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকায় দেহে খাদ্যশক্তি দিয়ে থাকে। চিনাবাদাম থেকে তেল হয়। মৌসুমে চিনাবাদাম শুকিয়ে মুখবন্ধ পাত্রে অনেকদিন রাখা যায়। তবে বাতাসের সংস্পর্শে ঝাঁঝালো গন্ধ হয় ও ছাতা পড়ে।

শাকসবজি

শাকসবজি ভিটামিন জাতীয় খাদ্য। বিভিন্ন ঋতুতে আমাদের দেশে নানা প্রকার শাকসবজি উৎপন্ন হয়। পুঁইশাক, পালংশাক, কলমিশাক, ডাঁটাশাক, লাউ, কুমড়াশাক ও কচুশাক ইত্যাদিতে রাইবোফ্লাভিন, ক্যালসিয়াম, লোহা, ভিটামিন সি ও ভিটামিন এ পাওয়া যায়।

লাউ, শিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ঝিঙা, পটোল, কাঁচকলা, ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজিতে ভিটামিন, খনিজ লবণ, শ্বেতসার ও পানি থাকে।

হলুদ, কমলা ও সবুজ বর্ণের শাকসবজিতে ক্যারোটিন থাকে। ক্যারোটিন দেহে ভিটামিন 'এ' তৈরি করে। টাটকা শাকসবজি ও টক জাতীয় ফলে ভিটামিন সি বেশি থাকে।

শাকসবজি কাটার আগে ধুয়ে নিতে হবে। বড় বড় টুকরা করে কেটে অল্প পানিতে কম মসলা দিয়ে সিদ্ধ করে খেতে হয়। গাজর, বীট, বাঁধাকপি, টমেটো, খিরা, মুলা, লেটুসপাতা, কিছু শাকসবজি প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় রাখা উচিত। দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শাকসবজির গুরুত্ব অত্যধিক। এসব কাঁচা সবজি দিয়ে তৈরি সালাদ উপকারী খাবার।



বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি

ফল

সব ঋতুতে এদেশে ফলমূল পাওয়া যায়। আমড়া, কামরাঙা, পেয়ারা, বাতাবিলেবু, আনারস ইত্যাদি টকজাতীয় ফলে ভিটামিন সি প্রচুর পরিমাণে থাকে।

পাকা আম, পেঁপে, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলে ভিটামিন এ থাকে। এছাড়া ফলে কার্বোহাইড্রেট, খনিজ লবণ, সামান্য পরিমাণে প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থ থাকে। আমাদের খাদ্য তালিকায় প্রতিদিন টাটকা ফলের ব্যবস্থা থাকা দরকার। কারণ ফলমূল দেহে পানির প্রয়োজন মেটায়, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ফলের কার্বোহাইড্রেট দেহে শক্তি যোগায়। ফল দিয়ে জ্যাম, জেলি, কাস্টার্ড ইত্যাদি খাদ্য তৈরি করা হয়।

মাছ

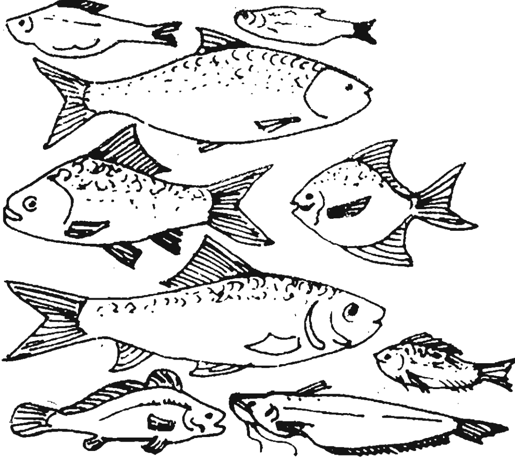
মাছ প্রাণিজ প্রোটিনের উৎকৃষ্ট উৎস। স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন এবং খনিজ লবণও মাছে পাওয়া যায়। সামুদ্রিক মাছে আয়োডিন থাকে। সামুদ্রিক মাছের তেল ও যকৃৎ থেকে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন ডি পাওয়া যায়।

রুই, কাতল, বোয়াল, চিতল ইত্যাদি বড় মাছ। পুঁটি, টেংরা, মলা–ঢেলা, চাপিলা ইত্যাদি ছোট মাছ। কৈ, মাগুর, শিং, শোল, টাকি ইত্যাদি জিয়ল মাছ। ইলিশ, চিতল, শরপুঁটি ইত্যাদি বেশি চর্বিযুক্ত মাছ। রূপচাঁদা, রিঠা, লাক্ষ্যা ইত্যাদি সামুদ্রিক বা লোনা পানির মাছ। ছোট মাছের কাঁটায় ক্যালসিয়াম, ফসফরাস পাওয়া যায়। শুঁটকি মাছে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি।

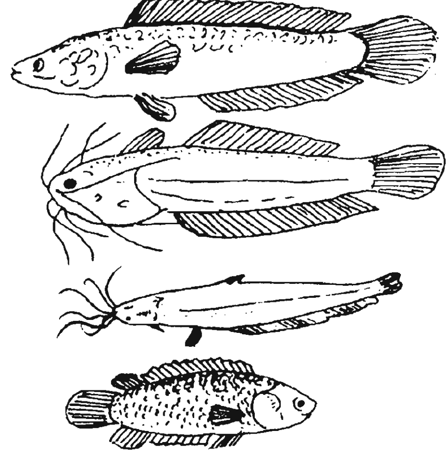


বিভিন্ন জাতের ফল

মাছ পচনশীল খাদ্য। ধরার সাথে সাথে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। বরফে মাছ ভালো থাকে। মাছের তন্তু খুব নরম। মাছ রান্না করতে অধিক সময় লাগে না। দেহ গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণে মাছের গুরুত্ব অত্যধিক।



বিভিন্ন প্রকারের মাছ

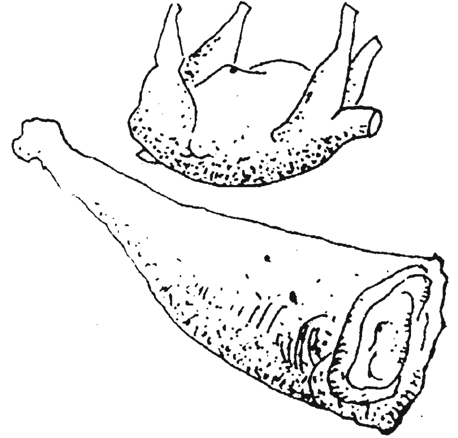


জিয়ল মাছ

মাংস

আমাদের দেশে গরু, খাসি, ভেড়া, মুরগি, হাঁস ও পাখির মাংস খাওয়ার প্রচলন আছে। মাংসে উৎকৃষ্ট মানের প্রোটিন আছে। এছাড়া মাংসে স্নেহ পদার্থ, খনিজ লবণ ও ভিটামিন পাওয়া যায়। আমাদের দেহ গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাপশক্তি উৎপাদনে মাংস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মাংস রান্নায় মাছের চেয়ে অধিক সময় লাগে। কারণ মাংসের আঁশগুলো মোটা ও কঠিনভাবে সংযুক্ত থাকে। উচ্চতাপে মাংসের প্রোটিন জমে যায়। সেজন্য মাংস মৃদুতাপে ধীরে ধীরে রান্না করা উচিত।

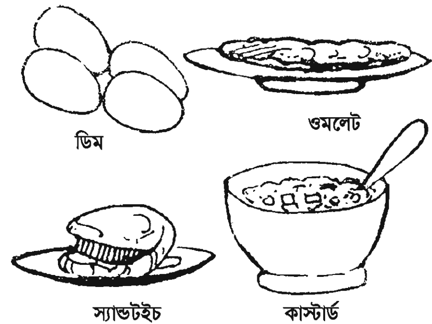


মাংস

ডিম

আমরা সাধারণত হাঁস ও মুরগির ডিম খেয়ে থাকি। ডিমে দেহ গঠনের জন্য সব পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়। ডিমের প্রোটিন উৎকৃষ্ট মানের। ডিমে স্নেহ পদার্থ, খনিজ লবণ ও ভিটামিন থাকে। ডিমের সাদা অংশে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি। কুসুমে স্নেহ পদার্থ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও প্রোটিন থাকে।

ডিম সিদ্ধ, ওমলেট ও পোচ করে খাওয়া ছাড়াও ডিমের তৈরি কাস্টার্ড, পুডিং, হালুয়া পুষ্টিকর খাবার। স্যান্ডউইচ তৈরিতে ডিম ব্যবহার করা হয়।



ডিম ও ডিমের তৈরি খাবার

দুধ

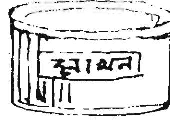
গরু, ছাগল ও মহিষের দুধ আমরা পান করি। দেহের গঠন, বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে উপাদান প্রয়োজন তার সবগুলো দুধে পাওয়া যায়। সেজন্য দুধকে পূর্ণাঙ্গ খাদ্য বলা চলে। দুধের প্রোটিন অত্যন্ত উৎকৃষ্টমানের। জন্মের পর শিশুর প্রধান খাদ্য মায়ের দুধ। মায়ের প্রথম দুধে রোগ প্রতিরোধের জন্য কলোস্ট্রাম নামক উপাদান থাকে, যা শিশুকে নানা রকম সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। দুধে ৮৭ ভাগই পানি। বাকি অংশ প্রোটিন, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ দিয়ে গঠিত। দুধ থেকে মাখন, ঘি, ছানা, পনির, মিষ্টি দই, পুডিং, কাস্টার্ড ইত্যাদি খাবার তৈরি হয়। টাটকা দুধ জীবাণুমুক্ত করার জন্য ফুটিয়ে পান করতে হয়। দুধ খোলা পাত্রে রাখলে সূর্যের আলো পড়ে ভিটামিন নষ্ট হয়। সেজন্য দুধের পাত্র ঢেকে রাখতে হয়। দুধ দুই ঘণ্টার বেশি ঘরোয়া তাপমাত্রায় রাখা উচিত নয়। রেফ্রিজারেটরে তুলে রাখলে ভালো থাকে।


টাটকা দুধ


ছানা


পায়েস


রসগোল্লা



মাখন


পুডিং

দুধ ও দুধের তৈরি খাবার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খাদ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও এর কুফল

প্রাচীনকাল থেকে দেখা গেছে যে, পরিবারের খাদ্য ব্যবস্থায় দাদি, নানি, চাচি এবং মায়েদের প্রভাব রয়েছে। খাদ্য নির্বাচনে কিছু ভিত্তিহীন প্রভাব আজও দেখা যায়, যেগুলো পারিবারিক রীতিনীতি ও খাদ্যাভ্যাস থেকে উদ্ভূত। বিবেচনা বা যুক্তিহীন এসব বিশ্বাস বা ধারণাকে খাদ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা বা কুসংস্কার বলে। খাদ্যজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মানুষ অসচেতন মনে কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে অপুষ্টির শিকার হয়। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খাদ্য বিষয়ে কিছু কুসংস্কার রয়েছে। মালয়েশিয়ায় গর্ভকালীন সময় প্রাণিজ খাদ্য মাছ, মুরগি, ডিম, দুধ দেওয়া হয় না। গর্ভের শিশু প্রাণীর স্বভাব পাবে বা হাঁপানি রোগ হবে সেই ভয়ে। ভারতে শিশুদের ডিম খাওয়াকে জন্ডিসের কারণ বলে ভ্রান্ত ধারণা আছে।

বাংলাদেশে খাদ্য বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণার কারণে গর্ভবতী, প্রসূতি মাতা, নবজাতক শিশু ও বর্ধিত বয়সের ছেলেমেয়েরা অপুষ্টির শিকার হয়।

গর্ভবতী মাতা

গর্ভের সময় মেয়েদের প্রয়োজনের চেয়ে কম খাবার দেওয়া হয়। বয়স্ক ব্যক্তিরা ভাবেন পরিমাণে বেশি খেলে সন্তান বড় হবে এবং প্রসবে অসুবিধা হবে। শিশুর গায়ের চামড়া ফাটা হবে সেজন্য খিরাই খেতে দেওয়া হয় না। চাল কুমড়ার হুলের মতো গায়ের লোম খাড়া হবে সে ভয়ে চাল কুমড়া খেতে দেওয়া হয় না। পূর্বে ডাব দেওয়া হত না শিশুর চোখের বর্ণ ঘোলাটে হবে বলে। যমজ সন্তান হওয়ার ভয়ে জোড়া কলা খেতে দেওয়া হত না।

গর্ভাবস্থায় মাছ খাওয়া সম্পর্কে অনেক কাল্পনিক কাহিনী আছে। বোয়াল মাছ খেলে সন্তানের মুখ বোয়াল মাছের মতো বড় হবে। বাইম মাছ খেলে পেটে বাচ্চা মোচড়াবে। খাসির গোশত খেলে শিশুর শরীরে লোম বেশি হবে। এসব ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে গর্ভবতী মায়েরা উৎকৃষ্ট প্রাণিজ প্রোটিন থেকে বঞ্চিত হন। ফলে মা হাড্ডিসার হয়ে দেহশক্তি হারিয়ে ফেলেন। প্রোটিন ক্যালরির অভাবে জন্ম দেন স্বাস্থ্যহীন, মেধাহীন অপুষ্ট শিশু।

প্রসূতি মাতা

এসব কুসংস্কারের প্রভাব থেকে প্রসূতি মাও রেহাই পান না। প্রসূতি মাকে ৪০ দিন আঁতুরঘরে আটকে রাখা হয় জিন ভূতের আছর থেকে মুক্ত রাখার জন্য। খাবার দেওয়া হয় মরিচ, আলু, কলাভর্তা ও নিরামিষের সাথে জাউভাত। সবার অন্ধ বিশ্বাস এসব খাবারে প্রসূতির শরীর তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠবে। এভাবে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় দুধ উৎপাদন করাও মায়ের পক্ষে সম্ভব হয় না। মায়ের সুস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করাও কষ্টকর হয়ে পড়ে।

শিশু

জন্মের পর শিশুকে মায়ের প্রথম দুধ বা শাল দুধ খেতে দেওয়া হয় না। বয়স্করা মনে করেন শাল দুধ ক্ষতিকর। কিন্তু এই দুধে থাকে রোগ প্রতিরোধকারী উপাদান কলোস্ট্রাম যা শিশুকে নানারকম সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা দেয়।

জন্মের পর প্রথম ৬ মাস মায়ের দুধই শিশুর একমাত্র খাদ্য। কিন্তু দেহ গঠনের জন্য ৬ মাস পর মায়ের দুধের পাশাপাশি ভাত, ডাল, সবজি, ফল, ডিম ইত্যাদি পরিপূরক খাবার দেওয়া দরকার। কিন্তু অনেকেই দুই বছর পর্যন্ত এসব খাবার শিশুর জন্য নিষিদ্ধ মনে করে। ভাত ডাল খেলে শিশুর পেট বড় হয়ে যাবে। সবজি, মাছ খেলে শিশু হজম করতে পারবে না। পেট খারাপ হবে। এসব ধারণার বশবর্তী হয়ে শুধু দুধ জাতীয় খাদ্য বা চালের সুজি খাওয়ানো হয়। ফলে প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ লবণের অভাবে রাতকানা, অন্ধত্ব, কোয়াশিয়রকর, ম্যারাসমাস ইত্যাদি পুষ্টির অভাবজনিত রোগে ভোগে। অনেক শিশু অকালে মারাও যায়।

মানুষ এসব ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। বংশের ধারা, পরিবেশ ও সামাজিক রীতিনীতির প্রভাবে ভুল ধারণাগুলো মানুষের মনে স্থান নেয়। খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত বাস্তব ধারণা ও শিক্ষা সাধারণ মানুষের মন থেকে ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে সাহায্য করবে। এ ব্যাপারে রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। স্কুল কলেজের পাঠ্যক্রমে পুষ্টি শিক্ষা দ্বারাও প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা দূর করা সম্ভব।

খাদ্যের সদভ্যাস গঠন

মানুষ অভ্যাসের দাস। শৈশবকাল থেকে খাদ্য সম্পর্কে সদভ্যাস গঠন করলে খাদ্যের প্রতি শিশুর সঠিক মনোভাব গড়ে ওঠে। ছোটবেলা থেকে বেছে খাওয়ালে বড় হলেও তাদের মধ্যে এটা না খাওয়া, ওটা না খাওয়ার অভ্যাস দেখা যায়। বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকলে খাদ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সহজে জন্মে না। খাদ্য সম্পর্কে সদভ্যাস গঠনে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

১। ৬ মাস পর দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাবার দেওয়া প্রয়োজন।

২। দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী ৬টি খাদ্য উপাদানই শিশুর খাদ্যে থাকবে।

৩। শিশুকে যে কোনো নতুন খাবারই প্রথমে অল্প দিতে হবে। অভ্যস্ত হলে পরিমাণ বাড়ানো যাবে।

৪। মৌসুমি যেসব খাদ্য পাওয়া যায় সেগুলো খাওয়ার অভ্যাস প্রত্যেককেই করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. ডাল, বাদাম, শিম ও মটর শুঁটির বিচিতে বেশি আছে–

ক. প্রোটিন খ. স্নেহ

গ. কার্বোহাইড্রেট ঘ. ভিটামিন

২. ঢেকিছাঁটা লাল চালে বেশি আছে?

ক. থায়ামিন। খ. রাইবোফ্লাভিন।

গ. ভিটামিন 'ডি'। ঘ. ভিটামিন 'এ'।

৩. আমাদের দৈনিক কত গ্লাস পানি পান করা উচিত?

ক. ৬–৯ খ. ৭–৮

গ. ৬–৭ ঘ. ৬–৮

৪. প্রোটিন প্রধান খাদ্য কোনগুলো?

i. মাংস, ডিম, আলু।

ii. মাছ, দুধ, ডাল

iii. মাংস, গম, ডাল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৫. ভিটামিন 'এ' এর উৎস কোনগুলো?

i. কচুশাক, গাজর, পুঁইশাক

ii. লালশাক, আম, মিষ্টিকুমড়া

iii. আমলকী, লেবু, কমলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৬. চিনাবাদামে বিদ্যমান উপাদানগুলোর নাম কী?

i. স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ

ii. খনিজ পদার্থ, ভিটামিন, প্রোটিন

iii. শ্বেতসার, ভিটামিন, স্নেহপদার্থ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭ থেকে ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পাপিয়ার বাড়ি রংপুর। কিছুদিন হলো তার গলা ফুলে গেছে এবং তার মধ্যে দুর্বলতা ও জড়তা দেখা দিয়েছে।

৭. নিচের কোনটির অভাবে পাপিয়ার গলা ফুলে গেছে?
   ক. ক্যালসিয়াম। খ. ফসফরাস।
   গ. আয়োডিন। ঘ. রাইবোফ্লাভিন।

৮. নিচের কোন খাদ্য পাপিয়ার গলা ফোলা রোগের জন্য উপকারী?
   ক. সামুদ্রিক মাছ খ. গরুর মাংস
   গ. ফলমূল ঘ. শাকসবজি

৯. পাপিয়ার কী রোগ হয়েছে?
   ক. বেরিবেরি খ. রিকেট
   গ. স্কার্ভি ঘ. গলগণ্ড

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জাহারার মা শাকসবজি কেটে ধুয়ে রান্না করেন এবং ফল কেটে ধুয়ে জাহারাকে খেতে দেন। জাহারা খুব কম খায়। তার দাঁতের মাড়িতে ঘা দেখা দিয়েছে। মা জাহারাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে ডাক্তার বললেন তার বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনের অভাব রয়েছে।

   ক. ভিটামিন কত প্রকার?
   খ. জাহারা ভিটামিনের অভাবে ভুগছে কেন?
   গ. জাহারার দাঁতের মাড়ির ঘার জন্য ডাক্তার কী খাবার খেতে দিলেন? কেন?
   ঘ. ডাক্তার তাকে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন খেতে বললেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

২. দুইটি শিশু–সন্তান ও স্বামীকে নিয়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত আলিফার সংসার। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ইদানীং তিনি মাছ, মাংস কিনতে পারছেন না। কিছু দিন থেকে শিশু দুটির স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আলিফা তার ছেলেমেয়েকে পুষ্টিযুক্ত খাবার যোগাতে চিন্তায় আছেন। তবে আলিফার শিশুরা শাকসবজি ও ডাল পছন্দ করে।

   ক. পুষ্টি কী?
   খ. শিশু দুইটির স্বাস্থ্য খারাপ দেখাচ্ছে কেন? ব্যাখ্যা কর।
   গ. আলিফা কীভাবে কম খরচে শিশু দুইটির পুষ্টির চাহিদা মিটাতে পারেন—ব্যাখ্যা কর।
   ঘ. ডাল ও শাকসবজির পুষ্টির তুলনামূলক বিবরণ দাও।

৩. অর্চির বয়স ৬ মাস। মা তাকে খিচুড়ি খাওয়াতে চাচ্ছেন। কিন্তু অর্চির দাদি বলেন, এতে অর্চির পেট বড় হয়ে যাবে, হজমে সমস্যা হবে। অর্চির মা তাকে বুঝালেন, অর্চিকে খিচুড়িসহ অন্যান্য খাদ্য না দিলে তার পুষ্টির অভাব হবে এবং খাদ্যের সুঅভ্যাস গঠিত হবে না।

   ক. অর্চির জন্য খিচুড়ি কোন ধরনের খাদ্য?
   খ. শুধু দুধের ওপর নির্ভর করলে অর্চির কী ধরনের পুষ্টির অভাব হতে পারে—বর্ণনা কর।
   গ. অর্চিকে খিচুড়ির পরিবর্তে অন্য কোনো খাবার দেওয়া যায়? পরামর্শ দাও।
   ঘ. শিশুর খাদ্য বিষয়ে অর্চির দাদির ধারণা বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পোশাক পরিচ্ছদ ও বয়নতন্তু

বস্ত্র তৈরির উপাদান ও প্রকারভেদ

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে চরকায় সুতা কেটে তাঁতিরা বস্ত্র তৈরি করত। সেই বস্ত্র দিয়ে পোশাক তৈরি করে মানুষ চাহিদা মেটাত। বস্ত্র তৈরির মূল উপকরণ তন্তু। এই তন্তু চুলের ন্যায় বা চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম এক প্রকার আঁশ। বিভিন্ন বস্তুর আঁশের গুণাগুণের মধ্যে পার্থক্য আছে। এজন্য সকল বস্তুর আঁশ থেকে কাপড় তৈরি করা যায় না। তুলার আঁশ সরু, মসৃণ ও নমনীয় বলে কাপড় প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু পাটের আঁশ মোটা, খসখসে বলে কাপড় তৈরির বিশেষ উপযোগী নয়।

বস্ত্র তৈরির উপযোগী তন্তুর গুণাবলি

১. লম্বা আঁশ বা তন্তু কাপড় বুনার বিশেষ উপযুক্ত। আঁশ ছোট হলেও ভাঁজ থাকলে ঐ আঁশ থেকে শক্ত সুতা তৈরি হয়। যেমন তুলার আঁশ লম্বায় ছোট। কিন্তু ভাঁজ থাকায় তুলা থেকে টেকসই বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

২. আঁশের নমনীয়তা বস্ত্র তৈরির একটি উৎকৃষ্ট গুণ। আঁশ মোচড়ালে বা দুমড়ালে যদি ভেঙে যায় তাহলে বস্ত্র তৈরি করা যায় না।

৩. রং ধারণ করার ক্ষমতা থাকা আঁশের একটি বড় গুণ। ট্যানিন নামক মোম জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ থাকলে আঁশে রং প্রবেশ করতে পারে না।

৪. আঁশের চাকচিক্য বা উজ্জ্বলতা সৌন্দর্য সৃষ্টির একটি গুণ। রেশম বা সিল্ক তন্তুর চাকচিক্যের জন্য রেশমি বস্ত্রের কদর বেশি।

৫. যেসব আঁশের ময়লা সহজে দূর করা যায় সেসব আঁশ বস্ত্র তৈরির জন্য উপযোগী।

৬. আঁশের ক্ষয় প্রতিরোধ করার শক্তি থাকবে।

৭. যেসব আঁশ স্বাভাবিক তাপে, মৃদু ক্ষার বা এসিডে সহজে নষ্ট হয় না সেগুলো বস্ত্র শিল্পে বিশেষ উপযোগী।

তন্তুর প্রকারভেদ

প্রকৃতিতে সহজে পাওয়া যায় এমন স্বাভাবিক তন্তু বস্ত্র তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বস্ত্রশিল্পে কৃত্রিম বা মানুষের তৈরি তন্তুর আবির্ভাব ঘটেছে।

বিভিন্ন তন্তুকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—

১। প্রকৃতিজাত বা স্বাভাবিক তন্তু (Natural Fibre)

২। কৃত্রিম বা মানুষের তৈরি তন্তু (Artificial Fibre)

প্রকৃতিজাত তন্তু উৎপত্তি অনুযায়ী তিন প্রকার। যেমন—

ক. উদ্ভিজ্জ তন্তু : যে তন্তু উদ্ভিদ বা গাছপালা থেকে পাওয়া যায় সেগুলো উদ্ভিজ্জ তন্তু। সুতি, লিনেন, র‍্যামি, পাট ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ তন্তু।

খ. প্রাণিজ তন্তু : যে তন্তু প্রাণী থেকে পাওয়া যায় সেগুলো প্রাণিজ তন্তু। রেশম, পশম প্রাণিজ তন্তু।

গ. খনিজ তন্তু : যে তন্তু খনিজ ধাতু থেকে পাওয়া যায় সেগুলো খনিজ তন্তু। যেমন অ্যাসবেসটস, গ্লাস ইত্যাদি।
কৃত্রিম বা মনুষ্যসৃষ্ট তন্তুগুলোকে দুভাগে ভাগ করা হয় যেমন-

ক. রেয়ন তন্তু : কাঠমন্ড, তুলার ছাঁট থেকে সেলুলোজ সংগ্রহ করে কস্টিক সোডা ও অ্যালকালি দিয়ে রাসায়নিক সংমিশ্রণে রেয়ন তন্তু তৈরি হয়। রেয়ন তিন প্রকার। যেমন- ভিসকস, কিউপ্রামোনিয়াম ও এসিটেট।

খ. সাংশ্লেষিক তন্তু : কয়লা, পানি ও বাতাস ব্যবহার করে মানুষ সাংশ্লেষিক তন্তু তৈরি করে। নাইলন, পলিয়েস্টার, ভিনিয়ন ইত্যাদি সাংশ্লেষিক তন্তু।

তন্তুর শ্রেণীবিভাগ

প্রাকৃতিক তন্তু		
উদ্ভিজ্জ	**প্রাণিজ**	**খনিজ**
তুলা লিনেন র‍্যামি পাট	রেশম পশম	গ্লাস অ্যাসবেসটস

কৃত্রিম তন্তু	
রেয়ন	**সাংশ্লেষিক**
ভিসকস কিউপ্রামোনিয়াম অ্যাসিটেট	নাইলন পলিয়েস্টার ভিনিয়ন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পোশাকের প্রয়োজনীয়তা

খাদ্য ও বাসস্থানের পর যে বস্তুটির বিশেষ প্রয়োজন তা হল পোশাক। মানুষের লজ্জা নিবারণ ও প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রথম পোশাকের প্রয়োজন দেখা দেয়। পরবর্তীতে সভ্যতার বিকাশের সাথে পোশাকের অন্যান্য প্রয়োজন সম্পর্কে মানুষ সচেতন হল। যেমন–দেহের সৌন্দর্য বাড়ান, দেহের দোষত্রুটি ঢাকা দেওয়া, নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি, পারিবারিক মানমর্যাদা প্রকাশ করা ইত্যাদি।

পোশাকের সংজ্ঞা

পোশাক বলতে সাধারণত বেশভূষাকে বোঝায়। মানুষ দেহে যে আচ্ছাদন বা আবরণ ব্যবহার করে, যার ফলে দেহের শালীনতা রক্ষা, শীত তাপ থেকে রক্ষা, শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, কাজ করার সুবিধা ও দেহকে রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখা যায়, তাকেই পোশাক বলে। মেয়েদের শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, ছেলেদের পায়জামা পাঞ্জাবি প্রত্যেকটি এক একটি পোশাক। পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব, পদমর্যাদা ও জাতীয়তার প্রকাশ ঘটে।

পোশাকের বিবর্তনের ইতিহাস

মানুষ কবে পোশাক পরতে আরম্ভ করে তা কেউ সঠিক বলতে পারে না। এক সময় ছিল যখন পোশাক পরিচ্ছদের কোনো প্রচলনই ছিল না। আদিম যুগে মানুষ মাথার চুল ও চামড়া দিয়ে শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি থেকে দেহ রক্ষার মাধ্যমে পোশাকের প্রয়োজন অনুভব করে। খাবারের চাহিদা মেটানোর জন্য তারা পশু শিকার করত। মাংস খাওয়ার পর চামড়া এবং হাড় পড়ে থাকত। মাছের কাঁটা এবং চিকন হাড় চামড়া ছিদ্র করার কাজে ব্যবহার করত। এই চামড়া দিয়ে দেহ ঢেকে রাখত। চামড়া পাথর দিয়ে পিটিয়ে নরম করে দেহ মুড়ে রাখত।

পরবর্তীতে ঘাস, লতা, পাতা দিয়ে কাপড়ের মতো বুনে দেহের আচ্ছাদনরূপে ব্যবহার করত। প্রস্তরযুগে মানুষ প্রতিকূল আবহাওয়া ও বন্য প্রাণীর কবল থেকে দেহকে রক্ষার জন্য সেলাইবিহীন পশুর চামড়া গায়ে জড়িয়ে চামড়ার বেল্ট বা প্রাণীর লেজ দিয়ে কোমরে বেঁধে রাখত। এর নাম ছিল লয়েন।

সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে ঘোড়া বা ভেড়ার লোম এবং গাছের আঁশ দিয়ে অবসর সময়ে সুতা তৈরি করে কাপড় বুনতে শিখল। সৌন্দর্য বিকাশের জন্য বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাকের প্রচলন হয়।

শিল্প বিপ্লবের জন্য নতুন মেশিন এবং মেশিনের পার্টস আবিষ্কার হওয়ার ফলে অতি আধুনিক পোশাক থেকে শুরু করে চাঁদে যাওয়ার পোশাক আজকাল তৈরি হচ্ছে। এছাড়া সাঁতার, ব্যায়াম ও বিশ্ব অ্যাথলেটিক খেলার বিশেষ পোশাকও মানুষ পরছে। এভাবে ধীরে ধীরে পোশাকের বিবর্তন হয়েছে।

স্বাস্থ্যের সাথে পোশাকের সম্পর্ক

দেহরক্ষার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি দেহের সঠিক বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্যও উপযুক্ত পোশাকের প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের সাথে পোশাকের বিশেষ সম্পর্ক আছে। পোশাক পরিধানের সময় যদি এই সম্পর্কের কথা মনে রাখা যায় তবেই পোশাক পরে আরাম পাওয়া যায়। পোশাক শুধু আরামই দেয় না, স্বাস্থ্যও রক্ষা করে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পোশাক পরিধানের কারণ-

১. ঠান্ডা ও গরমের তীব্রতা থেকে রক্ষা পাওয়া।

২. রোগজীবাণু থেকে রক্ষা পাওয়া।

৩. দেহে রক্ত সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি না করা ও

৪. মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা।

ঠান্ডা ও গরমের তীব্রতা থেকে রক্ষা পাওয়া

শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা পোশাক পরি। শীতকালে আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে। বায়ুর উষ্ণতা কমে যায়। এ সময় পশমি কাপড় বা গরম কাপড় পরে দেহ ঢেকে রাখলে শীতে আরাম পাওয়া যায়। শীতের উপযোগী কাপড় না পরলে ঠান্ডায় জ্বর, সর্দি, কাশি ইত্যাদি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গরমের দিনে পরিশ্রমের ফলে মানুষের প্রচুর ঘাম হয়। ঘাম শোষণের জন্য সুতি, ভয়েল ও পাতলা কাপড়ের পোশাক ব্যবহার করা ভালো। এসব কাপড়ের পোশাক পরে গরমে আরাম পাওয়া যায়। কোনো রকম জরি, লেস বসানো বা আলগা কাপড় বসানো ভারী পোশাক পরলে অধিক গরম লাগে। বাচ্চাদের হাতাকাটা পাতলা সুতি কাপড়ের পোশাক পরালে গরমের সময় আরাম পায় এবং স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

রোগজীবাণু থেকে রক্ষা পাওয়া

পোশাক দ্বারা দেহত্বক ঢাকা থাকায় রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়, চর্মরোগ হতে পারে না। দেহের ক্ষত স্থানে জীবাণু প্রবেশে বাধা দিয়ে ঘা শুকাতে সাহায্য করে।

দেহে রক্ত সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি না করা

খুব আঁটসাঁট জামাকাপড়ে শিরা, উপশিরা ও ধমনিতে চাপ পড়ে। রক্ত চলাচলে বাধা পায়। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে কষ্ট হয়। এ সমস্যাগুলো দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করে। সাধারণত যেসব পোশাক আরামদায়ক, চলাফেরায় কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করে না, দেহের বৃদ্ধি বজায় রাখে সে ধরনের পোশাকই শিশু এবং বর্ধিষ্ণু ছেলেমেয়েদের জন্য উপযোগী। এমন পোশাক পরিধান করা উচিত যা সহজে খোলা যায় ও পরা যায়। খুব আঁটসাঁট পোশাক যেমন ক্ষতিকর আবার অতিরিক্ত ঢিলেঢালা পোশাকও কাজ করার উপযোগী নয়। যেমন বেশি লম্বা ও ঢিলে পোশাক পরে শিশু খেলতে গিয়ে পড়ে হাত–পা ভেঙে ফেলে নতুবা দেহের কোনো অংশ কেটে ফেলে।

মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা

মনের সুস্থতার সাথে দেহের সুস্থতা জড়িত। সুন্দর ডিজাইনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরলে মন প্রফুল্ল থাকে। ব্যক্তিত্ব বাড়ে। মানুষের কাছে সম্মান পাওয়া যায়। ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় মন বিষণ্ন করে দেয়। শিশুরা নতুন জামাকাপড় পরলে খুশি হয়, তাদের মন আনন্দে ভরে যায়। সুতরাং পোশাক মানুষের মন প্রফুল্ল রেখে দেহ সুস্থ রাখে।

পোশাক ও জাতীয়তা

মানুষ ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে পোশাক পরে। পোশাক দেখে কোন দেশের লোক এবং কোন জাতি তা বোঝা যায়। পোশাক দিয়ে একটি পরিচয় পাওয়া যায়। আবার পোশাক দ্বারা মানুষের পেশা, শ্রেণী এবং বয়সের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের মেয়েদের পোশাক, শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট এবং সালোয়ার, কামিজ ও ওড়না। ছেলেদের ঘরে পরার পোশাক লুঙ্গি, গেঞ্জি, বাইরে বেড়াতে যাওয়ার ও অফিসের পোশাক পায়জামা, পাঞ্জাবি এবং শার্ট, প্যান্ট ইত্যাদি।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জাতি বাস করে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পোশাক পরে। যেমন শিখদের, মাথার পাগড়ি দিয়ে চেনা যায়। বর্মীদের পোশাক লুঙ্গি ও ফতুয়া, জাপানিদের পোশাক কিমোনো। মধ্য এশীয় মুসলমানরা লম্বা কুর্তা বা তোপ পরে এবং নিচে পরে ছোট প্যান্ট। মেয়েদের পোশাক লম্বা ঘাগরা, কুর্তা, চাদর, মাথার স্কার্ফ এবং সমস্ত শরীর ঢাকা বোরখা। ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদের শার্ট, স্যুট, টাই ইত্যাদি জাতীয় পোশাক।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পোশাকের ভিন্নতা দেখা যায়। বিশেষ করে, পাহাড়ি অঞ্চলের উপজাতিদের পোশাকে আঞ্চলিক প্রভাব দেখা যায়। ময়মনসিংহের গারো, সিলেটের মনিপুরী ও চট্টগ্রামের মগ, এদের পোশাক বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের পোশাক থেকে ভিন্ন ধরনের।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্য

প্রতিটি মানুষের জীবনে রয়েছে কিছু মৌলিক চাহিদা। এই চাহিদা পূরণ হলে জীবন সন্তুষ্টি ও আনন্দে ভরে ওঠে। পোশাকও এমন একটি মৌলিক চাহিদা যা জীবনের অনেক প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে। পূর্বে পোশাক পরার উদ্দেশ্য ছিল লজ্জা নিবারণ ও দেহকে গরম, শীত ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা করা। শিক্ষার বিস্তার ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে পোশাক পরিধানের বিভিন্ন উদ্দেশ্য মানুষ জানতে পেরেছে। পোশাকের মাধ্যমে একজন নিজেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। দেহের গঠন, গায়ের রং, আবহাওয়া, পেশা, আধুনিক ডিজাইন অনুযায়ী পোশাক পরে যে কোনো ব্যক্তি সহজেই অন্যের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পোশাক পরার একটি উদ্দেশ্য হল নিজের সৌন্দর্য বিকাশ করা। সুন্দর, মার্জিত পোশাক মানুষের চরিত্রের গুণাবলি প্রকাশ করে। এতে তার ব্যক্তিত্বও ফুটে ওঠে।

যেসব উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পোশাক পরা হয় সেগুলো নিচে বর্ণনা করা হল :

১. প্রতিকূল আবহাওয়া ও জলবায়ু থেকে দেহকে রক্ষা করা

ঋতুভেদে পোশাকের ভিন্নতা দেখা যায়। শীতের সময় পশমি, ফ্লানেল বা মোটা কাপড়ের পোশাক পরে আরাম পাওয়া যায়। পশমি কাপড় তাপ কুপরিবাহী হওয়ায় পশমি বস্ত্র ভেদ করে তাপ শরীর থেকে বের হয় না আবার বাইরের ঠান্ডা ও ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না।

গ্রীষ্মকালে সুতি, লিনেন, ভয়েল ইত্যাদির তৈরি কাপড় পরলে গরম থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এসব কাপড় দেহের ঘাম শুষে নেয়। তাপ সুপরিবাহী বলে বাতাস চলাচল করে দেহ ঠান্ডা রাখে।

২. বাইরের ধুলোবালি বা রোগজীবাণু থেকে দেহত্বককে রক্ষা করা

বাতাসে ধুলোবালি, অসংখ্য রোগজীবাণু ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন কাজকর্মে মানুষ প্রতিদিনই বাইরে বের হয়। পোশাক মানুষের দেহাবরণের কাজ করে। পোশাক পরা থাকলে বাইরের ময়লা আবর্জনা ও রোগজীবাণু পোশাকের ভিতর দিয়ে সহজে ত্বকের সংস্পর্শে আসতে পারে না। ডাক্তার এবং নার্সদেরও দেখা যায় রোগী সেবার সময় জীবাণু থেকে রক্ষা

পাওয়ার জন্য হাতে দস্তানা, গায়ে এপ্রোন ও নাকে মুখে মাসক পরে। রোগজীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে শরীর সুস্থ রাখা পোশাকের একটি উদ্দেশ্য।

৩. শালীনতা রক্ষা

আদিম যুগে মানুষ কোনো আবরণে দেহ ঢেকে রাখত না। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের মধ্যে শালীনতাবোধ জাগে। তখন থেকেই লজ্জা নিবারণের জন্য গাছের ছাল বাকল পরা শুরু হয়। পরবর্তীতে পোশাকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

মেয়ে পুরুষ উভয়েরই শালীনতা রক্ষার জন্য পোশাকের প্রয়োজন। কিশোরী বয়সে শরীরের পরিবর্তন হয়। সে সময় তাদের দরকার হয় ওড়না এবং ঢিলেঢালা পোশাক পরে আরামে চলাফেরা করা। পোশাকই দেহের শালীনতা বজায় রেখে সভ্য মানুষকে স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ দেয়। রুচিশীল মার্জিত পোশাক পরিধানকারী সকলের প্রশংসার পাত্র।

৪. শনাক্তকরণ

পোশাক যেমন একটি জাতির পরিচায়ক তেমনি বিশেষ ব্যক্তিকে চেনারও মাধ্যম। সব দেশেই বিশেষ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত পোশাক বা ইউনিফরম রয়েছে। যেমন- পুলিশ, প্রতিরক্ষা, বিমান ও নৌবাহিনী, ডাক্তার, সেবিকা, উকিল, পিয়ন, বাবুর্চি, চৌকিদার, ছাত্রছাত্রী। প্রত্যেকের নিজস্ব কাজের সুবিধার দিকে লক্ষ রেখে পোশাক তৈরি করা হয়। পোশাক দ্বারা এসব ব্যক্তির কাজের গুরুত্ব বোঝা যায়। পোশাক দ্বারা ব্যক্তি চিহ্নিত হলে তাদের কাছ থেকে কাজের সুবিধা পাওয়া যায়। জনসাধারণও তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নিতে পারে। যেমন, পোশাক পরা পুলিশ দেখে নিরাপত্তার জন্য অনুরোধ করা। রেস্টুরেন্টে বেয়ারাকে খাবারের জন্য নির্দেশ দেওয়া ইত্যাদি।

খেলোয়াড়দের জার্সি বা পোশাক দেখে বোঝা যায় কে ফুটবল খেলে, কে ক্রিকেট খেলে বা কে কুস্তিগীর। বাংলাদেশের উপজাতিদেরও পোশাক দেখে বলা যায় তারা কোন এলাকায় বসবাস করে।

৫. পদমর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

সব দেশেই বিশেষ পেশার জন্য নির্ধারিত পোশাক বা ইউনিফরম পরার নিয়ম আছে। কোনো কোনো অফিসে চাকরির মর্যাদা অনুযায়ী নিজস্ব পোশাক বা ইউনিফরম ব্যবহার করা হয়। বিশেষ পোশাক এবং তার সাথে মনোগ্রামসহ প্রতীক বা ব্যাজ ব্যবহারের ফলে উঁচু ও নিম্নমানের কর্মচারীদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়। পদমর্যাদা অনুযায়ী পোশাক পরলে নিম্নতম কর্মচারীদের তাদের বড় অফিসারদের প্রতি সম্মান দেখানো সহজ হয়। যেমন-রাস্তার ট্রাফিক পুলিশ ইউনিফরম পরা পুলিশ অফিসার দেখলে স্যালুট জানায়। অফিসের দারোয়ান গাড়িতে অফিসের পোশাক পরা কর্মকর্তাকে দেখে গেট খুলে দেয়। অফিসের পোশাক পরার জন্য প্রত্যেকে নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী স্বীকৃতি পায়। এজন্য কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। নিজ পেশার প্রতি সম্মানবোধ ইউনিফরমের আর একটি উদ্দেশ্য।



পুলিশ, ডাক্তার, ফুটবল খেলোয়াড়

৬. সৌন্দর্য বৃদ্ধি

নিজেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষের প্রচেষ্টা চলছে। পোশাক তেমন একটি উপযোগী মাধ্যম। মানুষ নিজের দেহের গঠন, গায়ের বর্ণ, আবহাওয়া, পরিবেশ ও চলতি ফ্যাশন অনুযায়ী রুচিসম্মত পোশাক পরে সহজেই অন্যের মন আকৃষ্ট করে। একজন রোগা, লম্বা মেয়ে যদি আড়াআড়ি ডিজাইনের ভারী কাপড়ের পোশাক পরে, তবে তাকে লম্বা ও রোগা কম লাগবে এবং সুন্দর দেখাবে। যে পোশাকে রঙের মিল, ডিজাইনের সমতা ইত্যাদি শিল্পনীতির প্রভাব থাকে, সে পোশাক মানুষকে সুন্দর ও মনোরম করে তোলে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাদাসিধে ডিজাইনের পোশাক মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক।

সতর্কতার সাথে পোশাক পরলে প্রত্যেকে নিজের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিজস্ব পোশাকের যত্ন ও সংরক্ষণ

ঘরে বাইরে আমরা নানা ধরনের জামাকাপড় পরি। প্রতিদিন ব্যবহার করার ফলে এসব জামাকাপড় ময়লা হয়ে যায়, ঘামে ভিজে দুর্গন্ধ হয়। কখনও অসাবধানতার জন্য ছিঁড়ে যায়। দাগ লেগে যায় বা কখনও রং বিবর্ণ হয়ে পড়ে। পোশাকের পরিচ্ছন্নতা, স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য পরিধানকারীর নিজস্ব যত্নের ওপর নির্ভর করে। প্রয়োজনমতো দৈনিক, সাপ্তাহিক ও বিভিন্ন ঋতুতে ব্যবহৃত জামাকাপড় পরিষ্কার করে ধুয়ে, শুকিয়ে জায়গামতো গুছিয়ে রাখলে পোশাকের মলিনতা দূর হয়। নতুনত্ব ফিরে আসে। তাছাড়া পোশাক টেকসই থাকে, প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা যায়, অর্থেরও অপচয় হয় না। অযত্নে পড়ে থাকলে অনেক মূল্যবান পোশাকও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বাড়ির ছোট বড় সব সদস্যকে পোশাকের কীভাবে যত্ন নিতে হয় শিখানো উচিত। তা না হলে গৃহকর্ত্রীর ওপর অধিক চাপ পড়ে। পোশাকের যত্ন বলতে সাধারণত ব্যবহারকালীন যত্ন, পোশাক মেরামত করা, দাগ তোলা, কাপড় ধোয়া, শুকানো, ইস্ত্রি করা ও ঠিক জায়গায় সংরক্ষণ করা বোঝায়। বাড়িতে পোশাকের নিম্নলিখিত যত্ন নেওয়া হয়-

১। দৈনিক যত্ন
২। সাপ্তাহিক যত্ন
৩। মৌসুমি যত্ন

দৈনিক যত্ন

দৈনিক ব্যবহারের জন্য সাধারণত সুতির জামাকাপড়ই বেশি ব্যবহার করা হয়। দৈনিক পরার পোশাকগুলো হলো– ইউনিফরম, সাধারণ জামাকাপড়, অন্তর্বাস, জুতা–মোজা, ফিতা ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিদিনই যত্ন নিতে হয়।

ইউনিফরম

স্কুল, কলেজ এবং অফিস আদালতের জন্য নির্ধারিত বস্ত্র ও ডিজাইনের পোশাককে ইউনিফরম বলা হয়। ইউনিফরম পরিষ্কার থাকলে প্রতিদিন ধোয়ার প্রয়োজন হয় না। দুদিন পরপর ধুলেও চলে। ব্যবহারের পর ঘাম শুকানোর জন্য খুলে ঝাড়া দিয়ে বাতাসে মেলে দিতে হয়। ঘাম শুকালে ইস্ত্রি ও ভাঁজ করে আলনা বা বাক্সে তুলে রাখলে পরদিন পরা যায়।

ইউনিফরম ময়লা হলে সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে নীল দিয়ে ইস্ত্রি করতে হবে। ইস্ত্রির পর ভাঁজ করে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হবে, যাতে সহজে পাওয়া যায়।

সাধারণ জামাকাপড়

সাধারণ জামাকাপড় পরে ঘরে বাইরে নানা ধরনের কাজ করা হয়। ফলে ময়লা হয়ে যায়, ঘামে ভিজে দুর্গন্ধ হয়। অনেক সময় বোতাম খুলে যায়। অসাবধানতার জন্য দাগ লাগতে পারে নতুবা খোঁচা লেগে ছিঁড়ে যেতে পারে। প্রথমে বোতাম লাগিয়ে নিতে হবে। ছেঁড়া থাকলে রিফু বা সেলাই করে নিতে হবে। কোনো দাগ লাগলে পদ্ধতি অনুযায়ী দাগ তুলতে হবে। সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে প্রয়োজনবোধে নীল মাড় দিয়ে শুকিয়ে ইস্ত্রি করতে হবে। এসব কাপড় ভাঁজ করে আলনা বা আলমারির এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

অন্তর্বাস

অন্তর্বাস বলতে গেঞ্জি, সেমিজ, জাঙ্গিয়া ইত্যাদি পোশাককে বোঝায়। যে কোনো অন্তর্বাসই গায়ের চামড়ার সাথে লেগে থাকে। সেজন্য ঘামে ভিজে দুর্গন্ধ হয়ে যায়, গায়ের ময়লা লেগে নোংরা হয়। অন্তর্বাস একবার ব্যবহারের পরেই সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকাতে হবে। সাদা হলে নীল দিতে হবে। এগুলোতে কখনও মাড় দিতে নেই। মাড় দিলে পরতে অস্বস্তি লাগবে।



ইউনিফরম পরা স্কুল ছাত্রী

জুতা–মোজা

বাইরে থেকে ফিরে পোশাকের সাথে মানুষ জুতা–মোজাও খুলে রাখে। জুতায় ময়লা থাকলে ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে বাতাসে শুকাতে দিতে হবে। ভিজে গেলে হালকা রোদে বা বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে। জুতা বেশি রোদ কিংবা আগুনের কাছে শুকালে কুঁচকে আকৃতি নষ্ট হয়ে যায়। কালি উঠে গেলে শুকিয়ে কালি দিয়ে রাখতে হবে। মোজা খুলে ঝেড়ে বাতাসে ঘাম শুকাতে হয়। মোজা ঘামে ভিজে খুবই দুর্গন্ধ হয়। সেজন্য প্রতিদিনই সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হবে।

ফিতা

মেয়েরা চুল বাঁধার জন্য সাদা, রঙিন বিভিন্ন কাপড়ের তৈরি ফিতা ব্যবহার করে। ব্যবহারের ফলে চুলের তেল, ময়লা লেগে ফিতায় দুর্গন্ধ হয়। কুঁচকে যায়। চুলের ফিতা ব্যবহারের পর প্রতিদিনই হালকা গরম পানি ও সাবান দিয়ে ধুয়ে শুকাতে হবে। পরে টানটানভাবে ইস্ত্রি করে ভাঁজ করতে হবে বা ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

সাপ্তাহিক যত্ন

যেসব কাপড় সপ্তাহে দু'তিন দিন পরে বাইরে যাওয়া হয়, সেগুলোর যত্ন সপ্তাহের যে দিন হাতে সময় থাকে সেদিন নিতে হয়। তাছাড়া অন্যান্য পোশাকেরও সাপ্তাহিক যত্ন আছে। যেমন– বোতাম লাগানো, ছিঁড়ে গেলে বা সেলাই খুলে গেলে মেরামত করা, ময়লা কাপড় ধোয়া, নীল মাড় দেওয়া, শুকানো, ইস্ত্রি করা এবং নির্দিষ্ট জায়গায় তুলে রাখা। এগুলোই কাপড়ের সাপ্তাহিক যত্ন। এছাড়া জুতায় কালি দেওয়া, ব্যাগ পরিষ্কার করা সাপ্তাহিক কাজের মধ্যে পড়ে।

মৌসুমি যত্ন

আমরা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি ঋতুভেদে পোশাক পরি। শীতকালে সোয়েটার, চাদর, মাফলার ইত্যাদি পশমি কাপড় বা ভারী কাপড় পরা হয়। শীতের মৌসুম শেষ হলে এসব কাপড় ধুয়ে, শুকিয়ে ঠিকমতো জায়গায় সংরক্ষণ করাকে মৌসুমি যত্ন বলে।

শীতের কাপড় ভালো করে ঝেড়ে রোদে শুকিয়ে তুলে রাখতে হয় অথবা ময়লা হলে শীতের শেষে ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকানোর পর কিছুক্ষণ বাতাসে বা ঠান্ডায় রাখা প্রয়োজন। গরম তাপ গেলে ট্রাংক বা আলমারিতে ভাঁজ করে তুলে রাখতে হবে। কোট, স্যুট হ্যাঙ্গারে ঝুলানো যায়। পশমি কাপড় হ্যাঙ্গারে ঝুলাতে নেই। এতে আকার নষ্ট হয়ে যায়। কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন দিতে হবে যাতে পোকায় না কাটে।

গরমকালে ব্যবহৃত পাতলা কাপড় শীত বা বর্ষাকালে পরার প্রয়োজন হয় না। সুতি কাপড় শীতের শুরুতে ধুয়ে শুকিয়ে ইস্ত্রি করে রাখতে হবে। মাড় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। মাড়সহ কাপড় তুলে রাখলে পোকায় কাটে এবং অনেক সময় হলুদ বর্ণ হয়ে যায়। যেসব দামি কাপড় মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হয় সেসব বর্ষার আগে ও পরে হালকা রোদে শুকিয়ে ঠান্ডা করে নির্দিষ্ট জায়গায় ভাঁজ করে রাখতে হবে। বর্ষার শেষে গরম কাপড় অবশ্যই রোদে দিতে হয় নতুবা ছাতা পড়ে যায়। বাক্সে বা আলমারিতে কাপড় রাখার জন্য নিচে পুরানো কাগজ না বিছিয়ে পুরানো কাপড় বিছানো ভালো। কাগজ সহজেই পোকায় আক্রান্ত হয়। কাগজের কালি কাপড়ে লেগে নোংরা হয়। এক মৌসুমের কাপড় অন্য মৌসুমে তুলে রাখলে বাক্সে অথবা আলমারিতে কাপড়ের ভাঁজে ন্যাপথলিন দিতে হবে। শুকানো কালোজিরা এবং মচমচে করে শুকানো নিমপাতার গুঁড়া দিয়ে কাপড়ের ছোট ছোট পুঁটলি তৈরি করে বাক্স এবং আলমারিতে রাখলে পোকামাকড় সহজে কাপড় নষ্ট করে না।

পোশাক সংরক্ষণের এককের পরিচিতি

পোশাক পরার পর নির্দিষ্ট জায়গায় যত্নসহকারে ভাঁজ করে বা প্রয়োজনবোধে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। যেখানে সেখানে পোশাক ফেলে রাখলে প্রয়োজনের সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। খুঁজতে গিয়ে অযথা সময়, শক্তি ব্যয় হয়। অন্যদিকে কাপড়চোপড় এলোমেলো থাকলে ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। পোশাকের ভাঁজ নষ্ট হয়। পোশাক ময়লা হয়। পোশাক সময়মতো হাতের কাছে পাওয়ার জন্য ব্যবহারভেদে আলমারি, ট্রাংক ও বাক্স ব্যবহার করতে হয়। ঘরের যেসব জায়গায় পোশাক সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকে সেসব জায়গাকে সংরক্ষণের একক বলা হয়। নিচে পোশাক সংরক্ষণের কয়েকটি এককের পরিচিতি দেওয়া হল–

আলমারি

সাধারণত কাঠ, স্টিল, হার্ডবোর্ড, রেক্সিন বা কাপড়ের তৈরি আলমারি পোশাক সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়। আধুনিক যুগে জায়গা বাঁচানোর জন্য দেয়াল আলমারির প্রচলন দেখা যায়। একটি আলমারিতে কয়েকটি তাক, হ্যাঙ্গার ঝুলানোর রড, ড্রয়ার, দরজায় হুক স্ট্যান্ড, মূল্যবান সামগ্রী রাখার জন্য গুপ্ত ড্রয়ার ইত্যাদি কয়েকটি ভাগ থাকে। কাঠ ও স্টিলের আলমারির বার্নিশ যেন পাকা হয়। খারাপ বার্নিশ এবং রং গরমের তাপে গলে কাপড়ে লেগে যেতে পারে। ভালো করে বার্নিশ শুকিয়ে কাপড় রাখতে হয়। দরজা ও ড্রয়ারে যেন ফাঁক না থাকে। তাহলে ধুলোবালি ও তেলাপোকা ঢুকে কাপড়ের ক্ষতি করে।

ট্রাংক–স্যুটকেস

প্রাচীনকালে ট্রাংকের ব্যবহারই বেশি ছিল। বর্তমানে ট্রাংকের ব্যবহার কমে আসলেও গ্রামে কাপড় রাখার জন্য এখনও ট্রাংক ব্যবহার করা হয়। ট্রাংক টিন ও স্টিলের তৈরি হয়। বড় ছোট বিভিন্ন আকারের হয়। ধরার জন্য দুপাশে হ্যান্ডেল থাকে। যেসব ট্রাংকের গভীরতা বেশি সেগুলোতে অনেক কাপড় রাখা যায়। ট্রাংকের ভিতর রঙের প্রলেপ থাকলে কাপড়ে মরিচা ধরে না। ট্রাংক স্যাঁতসেঁতে মেঝে বা মাটিতে রাখলে আর্দ্রতায় কাপড় নষ্ট হয়। বেশি ভারী ট্রাংক নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হয়। ঘরে যেখানে বাতাস চলাচল করে সেখানে ট্রাংকে পোশাক সংরক্ষণ করতে হয়। শহরে চামড়া এবং রেক্সিনের তৈরি স্যুটকেসের ব্যবহার প্রচলিত। শীত ও গ্রীষ্মের পোশাক ন্যাপথলিন দিয়ে স্যুটকেসে সংরক্ষণ করা হয়।

বাক্স

কাঠ, হার্ডবোর্ডের তৈরি ছোট বড় আকারের বাক্সে কাপড় সংরক্ষণ করা হয়। বেশি ভারী বাক্সকে গ্রামে সিন্দুক বলে। নাড়াচাড়ার সুবিধার জন্য পায়ায় চাকা লাগানো থাকে। বাক্সের ঢাকনা ভারী হলে ধুলোবালি ও পোকামাকড় ঢুকতে পারে না। বিভিন্ন প্রকার পোশাক সংরক্ষণের জন্য বাক্সের মধ্যে পার্টিশন থাকে। কাঠের বাক্সের গায়ের কাজ করা ও মসৃণ বার্নিশ থাকলে ঘরের একটি মূল্যবান আসবাব হিসেবে সৌন্দর্য বাড়ায়।

আলনা

সোজা কাঠের রড বিশিষ্ট স্ট্যান্ডকে আলনা বলে। আলনা বড়, ছোট বিভিন্ন সাইজের হয়। জুতা ও অন্যান্য জিনিস রাখার জন্য আলনার নিচে বাক্স বা র‍্যাক থাকে। আলনা ঘরের একপাশে রাখা ভালো। জানালার সামনে রাখা উচিত নয়, বাতাস চলাচলে অসুবিধা হয়। আলনার রডগুলো খুব মসৃণ হবে যেন পোশাকের সুতা আটকে না যায়। ভালোভাবে বার্নিশ করা থাকলে টেকসই হয়, পোশাকের ক্ষতি হয় না।

সঠিক পদ্ধতিতে পোশাক সংরক্ষণ

পোশাকের যত্নে সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। বাইরের ধুলোবালি, কীটপতঙ্গ, জলীয়বাষ্প ইত্যাদি থেকে রক্ষা করার জন্য পোশাক সংরক্ষণের একান্ত দরকার। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখলে সহজেই ছত্রাক জমে পোশাক নষ্ট হয়। নিয়ম অনুযায়ী পোশাক সংরক্ষণ না করলে প্রয়োজনের সময় সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। এতে সময় নষ্ট হয় এবং বিরক্তিকরও বটে।

পোশাক সংরক্ষণের আগে জায়গা ও আসবাবপত্র এমনভাবে রাখতে হবে যেন বাতাস চলাচল করে এবং ধুলোবালি কম ঢোকে। পোশাক সংরক্ষণের জন্য ট্রাংক, আলমারি ব্যবহার করা ভালো। কারণ এগুলোতে কাপড় সংরক্ষণ করা বেশ সহজ ও নিরাপদ। পোশাক সংরক্ষণের সময় নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করা উচিত—

সংরক্ষণের পূর্ব প্রস্তুতি

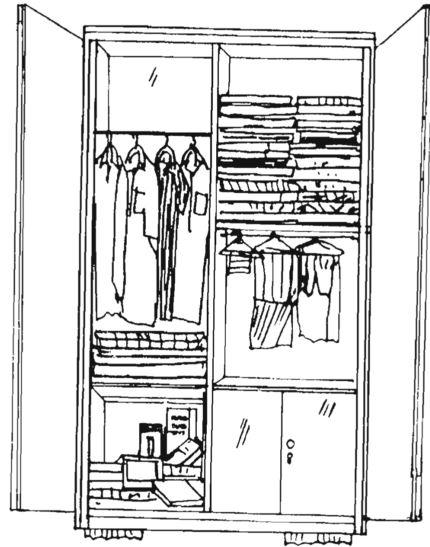
সংরক্ষণের পূর্বে পোশাকের কোনো জায়গা ছেঁড়া থাকলে মেরামত করে নিতে হবে। দাগ অপসারণ করে পদ্ধতি অনুযায়ী ধুয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। পোশাক যেন ভিজা বা আর্দ্র না থাকে। ইস্ত্রি করার পর বাতাসে শুকিয়ে ঠান্ডা করে সংরক্ষণ করা উচিত। দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য পোশাকে নীল, মাড় দেওয়া ঠিক নয়। কোট, শার্ট, ব্লাউজ বা অন্যান্য জামাকাপড়ে ধাতুর তৈরি বোতাম, হুক, কাফলিং থাকে। এগুলো খুলে রাখলে মরিচা পড়ে না।

শ্রেণী ও আকৃতি অনুযায়ী

পোশাক সংরক্ষণ

বিভিন্ন ধরনের পোশাক আমরা ব্যবহার করি। যেমন শার্ট, প্যান্ট, কোট, পায়জামা, পাঞ্জাবি, শাড়ি, ব্লাউজ, গরম কাপড়, চাদর, রুমাল, টুপি ইত্যাদি।

স্যুট, প্যান্ট, দামি শাড়ি আলমারির রডে হ্যাঙ্গার দিয়ে ঝুলিয়ে রাখলে ভাঁজ নষ্ট হয় না। ব্লাউজ হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলে হুকের দাগ পড়ে না। মেয়েদের জামা, পায়জামা, স্কার্ট ইত্যাদি পোশাকও হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলে কুঁচকায় না বা ভাঁজ পড়ে না। সুতির শাড়ি, পায়জামা, পাঞ্জাবি, চাদর এ ধরনের কাপড়গুলো ভাঁজ করে আলমারির তাকে কিংবা ট্রাংক, বাক্সে সারি করে রাখা যায়। তবে পোশাকের ধরন অনুযায়ী পৃথকভাবে রাখলে প্রয়োজনের সময় বেশি খুঁজতে হয় না।



আলমারির নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষিত বিভিন্ন পোশাক

ছোট বড় আকৃতির কাপড়গুলো আলাদা রাখা উচিত। রুমাল, টুপি, মোজা, ফিতা ইত্যাদি শাড়ির ভাঁজ কিংবা বড় কাপড়ের মধ্যে ঢুকে গেলে সহজে পাওয়া যায় না। এগুলো আলমারির ড্রয়ার কিংবা বাক্সের নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা উচিত। টাই আলমারির দরজায় রড বা হুক স্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে রাখলে ভালো থাকে।

ব্যবহার অনুযায়ী পোশাক সংরক্ষণ

কিছু কাপড় আমরা প্রায় প্রতিদিনই পরি। এগুলো আলনায় রাখা যায় নতুবা বাক্সে বা আলমারির নিচের তাকে হাতের কাছে রাখতে হয়। আলনায় শার্ট, ফ্রক, ব্লাউজ ইত্যাদি হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলে ভাঁজ নষ্ট হয় না। শাড়ি, লুঙ্গি, পায়জামা এ ধরনের কাপড়গুলো ভাঁজ করে আলনার আলাদা আলাদা তাকে রাখলে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

যেসব কাপড় কোনো উপলক্ষে বা অনেকদিন পর পর আমরা ব্যবহার করি সেগুলো আলমারির উঁচু তাকে বা ট্রাংক, বাক্সে নিচের দিকে রাখা যায়। সোয়েটার, গরম চাদর, মাফলার ইত্যাদি শীতের দিনে ব্যবহারের কাপড়গুলো আলমারির উঁচু তাকে কিংবা একপাশে জায়গা করে রাখতে হয়। ট্রাংক, বাক্সে গরম কাপড় ভালো থাকে।

পশমি সোয়েটার ঝুলিয়ে রাখতে নেই। সাদা বা বাদামি কাগজে রোল করে সোয়েটার, চাদর রাখলে ভাঁজ পড়ে না।

সবসময় ব্যবহারের জুতা আলনার নিচে বাক্সে কিংবা আলাদা জুতার র‍্যাকে পরিষ্কার করে রাখা যায়। আলমারির নিচে জুতা রাখার নির্দিষ্ট তাকে মাঝে মধ্যে ব্যবহারের দামি জুতা সংরক্ষণ করা হয়।

কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করা

পোশাক সংরক্ষণের আগে খালি আলমারি, বাক্স বা ট্রাংকে পোকামাকড়ের ওষুধ ছিটিয়ে দুদিন রাখতে হবে। এরপর ভাল করে ঝেড়ে গন্ধ দূর হলে কাপড় রাখতে হয়। কাপড়ের ভাঁজে, বিশেষ করে গরম কাপড়ে ন্যাপথলিন দিতে হয়। চা পাতা, শুকানো কালোজিরা বা নিমপাতা শুকিয়ে গুঁড়া করে কাপড়ের ছোট ছোট পুঁটলি করে আলমারি বা বাক্সে রাখলে সহজে পোকা বাসা বাঁধে না।

রোদে শুকানো

দীর্ঘদিন বাক্স বা আলমারিতে কাপড় থাকলে গন্ধ হয়। বর্ষার পর আর্দ্রতায় এবং বাতাস চলাচলের অভাবে পোশাকে ছাতা পড়ে যায়। এজন্য আলমারি, ট্রাংক ও বাক্সের কাপড় মাঝে মাঝে বের করে রোদে বা বাতাসে শুকিয়ে ঠান্ডা করে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হয়। এতে অনেকদিন সংরক্ষিত পোশাক ভালো থাকে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কোন দেশে কিমোনো পোশাক ব্যবহার করা হয়?

ক. ভারত　　খ. চায়না
গ. গ্রিস　　ঘ. জাপান

২. পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্য কী?

i. বাইরের ধুলোবালি বা রোগজীবাণু থেকে দেহ ত্বককে রক্ষা করা।
ii. প্রতিকূল আবহাওয়া ও জলবায়ু থেকে দেহকে রক্ষা করা।
iii. পোশাক ব্যক্তিকে শনাক্ত করে শালীনতা রক্ষা করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৩ থেকে ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

জামাল সাহেব বছরের বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন তন্তুর পোশাক ব্যবহার করে। তিনি যত্নের সাথে তার পোশাকগুলো সংরক্ষণ করেন যাতে পোশাকগুলো ব্যবহার উপযোগী থাকে।

৩. জালাল সাহেব কোন উপায়ে পোশাকের যত্ন করেন।

i. দৈনিক ii. মৌসুমি
iii. সাপ্তাহিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য পোশাকে কী দেওয়া উচিত নয়?

ক. গ্লিসারিন খ. সিরকা
গ. রিঠা ঘ. মাড়

৬. কোন সময় পোশাকে ছাতা পড়ে–

ক. গ্রীষ্ম খ. বর্ষা
গ. শীত ঘ. শরৎ

৭. জামাল সাহেব তার পোশাকগুলো কীভাবে সংরক্ষণ করেন?

i. মাড় দিয়ে কাপড় আলমারিতে তুলে রাখেন
ii. কাপড়ের ভাজে ন্যাপথলিন দেন
iii. শুকনো কালোজিরা ও নিমপাতা দিয়ে রাখেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী মৌসুমি সুতি তন্তুর তৈরী বস্ত্র পছন্দ করে তবে উৎসব অনুষ্ঠানে সে রেশম বস্ত্র পরিধান করে। মৌসুমি পোশাক পরিধানের সময় ঋতুকে খুব প্রাধান্য দেয় এবং ঋতু শেষে যত্ন সহকারে পোশাক সংরক্ষণ করে।

ক. তন্তু কী?
খ. মৌসুমি পোশাক পছন্দের ক্ষেত্রে ঋতুকে প্রাধান্য দেয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. মৌসুমি কীভাবে তার পোশাক সংরক্ষণ করে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সুতি কাপড় ও রেশম কাপড়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

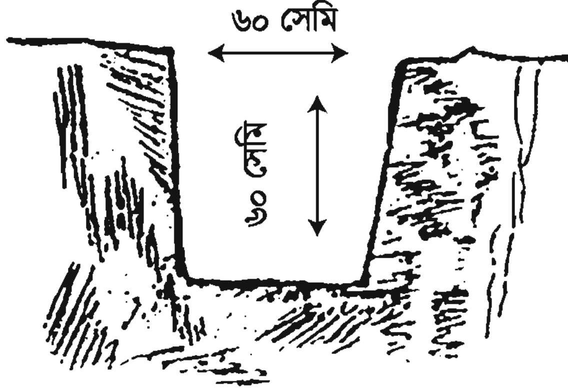
২. অফিসে কামাল সাহেব শীতকালে স্যুট টাই পরেন। শীত চলে গেলে তিনি শার্ট ও প্যান্ট ব্যবহার করেন। শীতে ব্যবহৃত পোশাকগুলো না ধুয়ে আলমারিতে তুলে সংরক্ষণ করে রাখেন। কিন্তু পরবর্তী শীতে যখন তিনি আবার সে পোশাক পরিধান করতে চান তখন দেখেন পোশাকগুলো পরিধানের অনুপযোগী।

ক. পোশাক কী?
খ. পোশাক সংরক্ষণ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।
গ. কী করলে কামাল সাহবের পোশাক ব্যবহারের অনুপযোগিতা থেকে রক্ষা করা যেত বলে তুমি মনে কর।
ঘ. ঋতুভেদে তার পোশাক পরিবর্তনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করা কর।

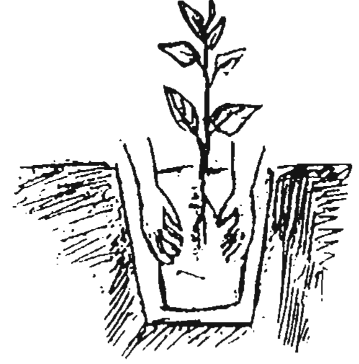
ব্যবহারিক

পঞ্চম অধ্যায়

গর্ত করে ফলের চারা লাগানো

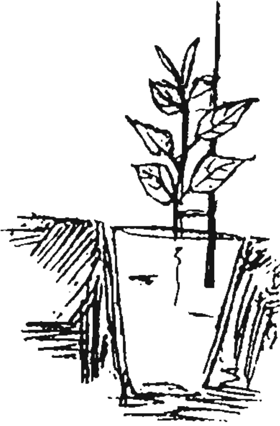


চারা রোপণের গর্ত। গর্তের মাপ ৬০ সেমি X ৬০ সেমি

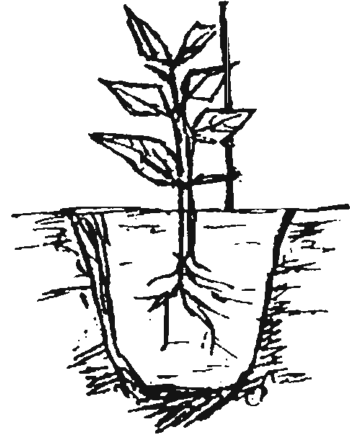


গর্তে চারা লাগানোর দৃশ্য

চারা রোপণের কমপক্ষে ৭ দিন আগে গর্তের ওপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি ওপরে দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।



খুঁটি দিয়ে চারা হালকাভাবে বেঁধে দিতে হবে



গর্তে লাগানো চারার ছবি

চারা লাগানোর পর পরই ঝাঁঝরির সাহায্যে চারায় পানি দিতে হবে।

সবজি চাষ পদ্ধতিতে সবজি বাগান করা

সবজি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামাদি

১. সবজি চাষের মডেল
২. জমি মাপার টেপ

৩. কোদাল
৪. নিড়ানি
৫. ঝাঁঝরি
৬. বাগানে পানি দেওয়ার পাইপ
৭. ২০ কেজি শুকনো গোবর সার বা আবর্জনা পচানো সার

সবজি চাষের প্রস্তুতি ও চাষ

১. প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামাদির যোগাড়
২. বাগানের জন্য জমি নির্বাচন
৩. সবজি চাষের মডেল অনুসরণে বাগানের নকশা তৈরি
৪. বেড়া তৈরি
৫. জমি তৈরি—মডেল বা নকশা অনুযায়ী
৬. বীজ বপন বা চারা রোপণ
৭. বাগানের পরিচর্যা

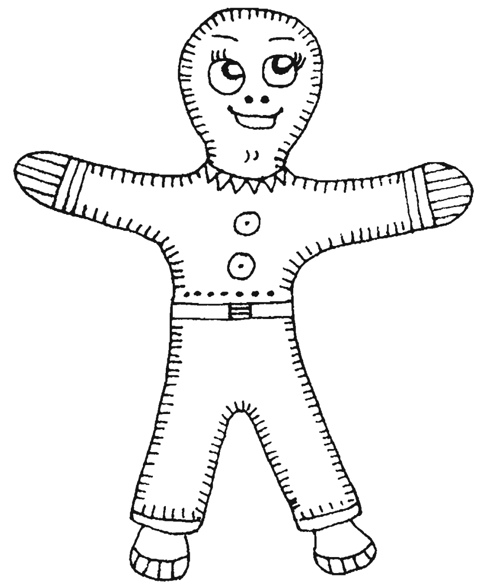
শিশুদের উপযোগী ঝুমঝুমি ও পুতুল তৈরি

খেলনা শিশুর আনন্দ বর্ধনের খোরাক হলেও শিশুর জীবনে খেলনার অনন্য মূল্য রয়েছে। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বিকাশে খেলার সামগ্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুর খেলনার নিম্নলিখিত গুণাবলি থাকবে–

১. **নিরাপদ হতে হবে–** খেলনা তৈরির সামগ্রী এমন হতে হবে যেন শিশু আঘাত না পায়। কাপড়, হালকা মসৃণ কাঠ, নরম রবার ইত্যাদির তৈরি খেলনা শিশুর জন্য নিরাপদ।
২. খেলনা রঙিন এবং আকর্ষণীয় হবে কিন্তু রং যেন পাকা হয়।
৩. হালকা এবং শিশুর বয়স অনুযায়ী আকার হবে, যেন শিশু সহজে নাড়াচাড়া করতে পারে।
৪. বয়স উপযোগী হবে, যেমন ১ বছরের শিশুর জন্য ঝুমঝুমি, লাটিম, কাপড়ের পুতুল, নরম রবারের বল ইত্যাদি।

পুতুল তৈরির পদ্ধতি

১. পুতুলের ছবি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আকারের (বড় বা ছোট) সাদা কাগজে একটি নকশা আঁকতে হবে।
২. হালকা রঙিন কাপড় ভাঁজ করে তার ওপর কাগজের নকশা বসিয়ে পিন আটকিয়ে নিতে হবে।



পুতুলের নকশা

৩. নকশা অনুযায়ী কাঁচি দিয়ে চারপাশে কেটে আকৃতি ঠিক রেখে বখেয়া সেলাই দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।
৪. কোনো এক পাশে ২.৫ সে. মি. জায়গা খোলা রাখতে হবে উল্টিয়ে সোজা করার জন্য।
৫. সোজা করে খোলা অংশের ভিতর তুলা অথবা ছোট কাপড়ের টুকরা ঠেসে ভরে পুতুলের আকৃতি দিতে হবে।
৬. শক্ত করে তুলা ভরার পর খোলা অংশটির কাপড়ের ধারগুলো ভেতরে মুড়ে সেলাই করে বন্ধ করে দিতে হবে।
৭. এরপর কালো কালি বা কালো সুতা দিয়ে চোখ, নাক, মুখ, চুল ইত্যাদি এঁকে দিতে হবে। এভাবে অনেকে কুকুর, বিড়াল, মাছ ইত্যাদি তৈরি করে।
৮. এসব পুতুলের গায়ে বিভিন্ন পোশাক পরিয়ে এবং লেইস, চুমকি বসিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়।

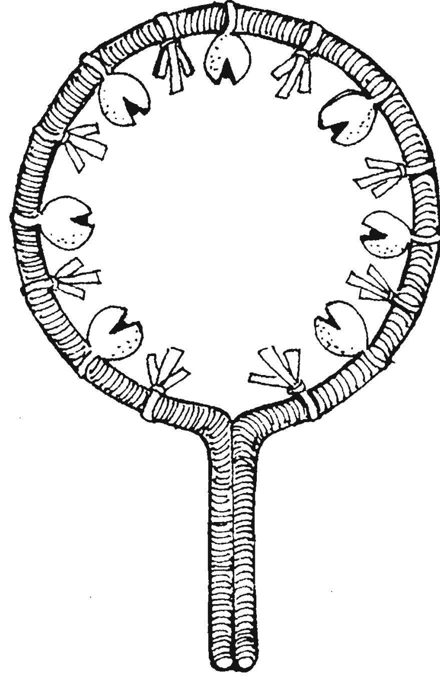
ঝুমঝুমি তৈরি

যেসব শিশু সাধারণত শুয়ে বসে থাকে তাদের জন্য ঝুমঝুমি উপযোগী। ঝুমঝুমি যে রকমই হোক কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকবে। যেমন–

১. বাজবে, সুন্দর শব্দ করবে।
২. ধরার হাতল মসৃণ ও গোলাকার হবে, যেন শিশুর হাতে ব্যথা না লাগে।
৩. কাপড়, মসৃণ নরম বেত, রবার বা হালকা মসৃণ কাঠ দিয়ে তৈরি হবে।
৪. বেশি বড় বা ভারী হবে না

ঝুমঝুমি তৈরির পদ্ধতি

১. মসৃণ সরু গোল আকৃতির ৮৭ সে. মি. বেত নিতে হবে।
২. বেতটির মাঝামাঝিতে ২০ সে. মি. ব্যাসের একটি বৃত্ত তৈরি করতে হবে। বৃত্তের অংশ বাদ দিয়ে দুপাশের হ্যান্ডেলের জন্য বেত সমান থাকবে।
৩. দুপাশের বেতের অংশ দুটি একত্রে জোড়া দিয়ে রঙিন সুতা দিয়ে সেঁটে বাঁধতে হবে। এ বাঁধন দিয়ে ধরার হাতল সম্পূর্ণ ঢেকে দিতে হবে।



ঝুমঝুমি

৪. ঝুমঝুমির হাতলের দৈর্ঘ্য হবে ১২ সে. মি।
৫. সুতার বাঁধনের ওপর নরম করার জন্য রঙিন বা ছাপার মোলায়েম সুতির কাপড়ও পেঁচানো যায়।
৬. বৃত্তাকার অংশটিও হ্যান্ডেলের মতো সুতা ও কাপড় দিয়ে পেঁচাতে হবে।
৭. এবার বৃত্তাকার অংশে ৭/৮টি হালকা নরম প্লাস্টিকের ছোট ঘুঙুর ছবি অনুযায়ী শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে।
৮. দুটি ঘুঙুরের মধ্যে খালি জায়গায় রঙিন ফিতা কেটে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

রান্নাঘরে দৈনন্দিন সাজসরঞ্জামাদির সাথে পরিচয় ও তালিকা তৈরি

রান্না ঘরে খাদ্য প্রস্তুতের সময় বিভিন্ন রকমের কাজ হয়। যেমন– কুটাবাছা, ধোয়া, রান্না ও পরিবেশন করা। এসব কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকার ধাতুর তৈরি সরঞ্জাম ব্যবহার হয়। খাদ্য প্রস্তুতে যাওয়ার আগে শিক্ষার্থীরা এসব সরঞ্জামের সাথে পরিচিত হবে। কাজ অনুযায়ী তালিকা তৈরি করতে এবং যত্ন সম্পর্কে জানবে।

কাজের ধরন অনুযায়ী রান্নাঘরে ব্যবহৃত সরঞ্জামের তালিকা–

মাপার সরঞ্জাম– চায়ের চামচ, টেবিল চামচ, কাপ, গ্লাস, এক সেট মাপার সরঞ্জাম।

কাটার সরঞ্জাম– ছুরি, বঁটি, দা, কুরুনি (নারিকেল ও সবজি), বিস্কুট কাটার নকশা।

মিশাবার সরঞ্জাম– চামচ, ঘুটনি, বিটার, চালনি, গামলা, খঞ্চা, থালা, বাটি ইত্যাদি।

রান্না করার সরঞ্জাম– বিভিন্ন আকারের হাঁড়ি, সসপ্যান, কড়াই, ফ্রাইপ্যান, তাওয়া, প্রেশার কুকার।

পরিবেশনের সরঞ্জাম– ডিশ, গামলা, বাটি, চামচ, গ্লাস, ট্রে ইত্যাদি।

রান্না ঘরে অ্যালুমিনিয়ম, স্টেনলেস স্টিল, কাচ, লোহা, মেলামাইন, বাঁশ, কাঠ, মাটি প্রভৃতির তৈরি সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়। তবে রান্নার জন্য অ্যালুমিনিয়মের পাত্রই বেশি ব্যবহার হয়। লোহার কড়াই ভাজির জন্য উপযোগী। লোহা ও তামার পাত্রে টকজাতীয় খাদ্য রান্না করলে বিষাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

যত্ন

সব সরঞ্জামই কাজ শেষ হলে পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখা উচিত। অ্যালুমিনিয়মের সরঞ্জাম ছাই দিয়ে মেজে সাবান দিয়ে ধুলে পরিষ্কার থাকে। স্টেনলেস স্টিল, কাচ, মেলামাইন, বাঁশ ও বেতের সরঞ্জাম শুধুমাত্র সাবান পানি দিয়ে ধুলে পরিষ্কার হয়ে যায়। পাত্রে খাদ্য লেগে থাকলে প্রথমে ভিজিয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণের জন্য। তারপর ছোবড়া বা স্পঞ্জ দিয়ে ঘষলে উঠে যাবে। তেল উঠানোর জন্য গরম পানি ও সাবান ব্যবহার করতে হয়।

সকল প্রকার সরঞ্জামই ধুয়ে র‍্যাক বা তাকে রাখলে পানি সহজে ঝরে যায়। পানি ঝরিয়ে মোটা কাপড় বা ডিশ তোয়ালে দিয়ে মুছে রান্নাঘরে সাজিয়ে রাখলে কাজের সময় সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়। রান্নাঘরে সরঞ্জামগুলো তাকে বা আলমারিতে ছোট বড় হিসেবে সাজিয়ে রাখলে খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট করতে হয় না। যেসব সরঞ্জাম মাঝে মধ্যে ব্যবহার করা হয় সেগুলোও ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার রাখা উচিত।

খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন

রান্নার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা

টাটকা ফল ও সালাদে ব্যবহৃত কিছু সবজি আমরা কাঁচা খেয়ে থাকি। কিন্তু বেশিরভাগ খাদ্যই রান্না করে খেতে হয়। খাদ্য রান্নার উদ্দেশ্য তিনটি :

১. খাদ্য সহজপাচ্য করার জন্য–
মাছ, মাংস, শাকসবজি, চাল, ডাল সুসিদ্ধ করে খেলে সহজে পরিপাক হয়। পুষ্টিমূল্য বেশি পাওয়া যায়।

২. খাদ্যের অণুজীব ধ্বংস করার জন্য–
খাদ্যদ্রব্য অনেক সময়ই নানা রকম জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। রান্নার উত্তাপে এসব জীবাণু মরে খাদ্যকে নির্দোষ করে।

৩. খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি করার জন্য—
খাদ্য বিভিন্ন উপকরণ ও মসলা দিয়ে রান্না করা হয়। সেজন্য খাবারের স্বাদ, গন্ধ পুষ্টিমান বেড়ে যায়। তাছাড়া রান্নার ফলে খাদ্যের ভিতর থেকে নির্যাস বের হয় এবং স্বাদ, গন্ধ বৃদ্ধি পায়।

রান্নায় সতর্কতা

খাদ্যদ্রব্য যে পদ্ধতিতেই রান্না করা হোক না কেন আমাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকবে যেন নির্দিষ্ট খাদ্যের পুষ্টিমান অধিক পরিমাণে বজায় থাকে। খাদ্য প্রস্তুতের বিভিন্ন ধাপেই খাদ্যের পুষ্টিমান অপচয় হয়। যেমন– কাটার সময়, ধোয়ার সময়, রান্নার সময় ও পরিবেশনের সময়।

খাদ্য রান্নায় সতর্কতা অবলম্বন

১. শাকসবজি কাটার আগে ধুতে হবে।

২. খোসা ছাড়ানোর পর যথাসম্ভব বড় টুকরা করতে হবে।

৩. কাটার পর বেশিক্ষণ বাইরে ফেলে না রেখে চুলায় রান্না বসিয়ে দিতে হবে।

৪. শাকসবজি রান্নায় অল্প পানি ব্যবহার করতে হবে। সিদ্ধ করে পানি ফেলা উচিত নয়।

৫. ঢেকে খাদ্যদ্রব্য রান্না করতে হবে।

৬. খাদ্যদ্রব্য সুসিদ্ধ হতে যতটা সময় লাগবে ততক্ষণই চুলায় রাখতে হবে। বেশিক্ষণ সিদ্ধ করলে খাবারের রং, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায়। তাছাড়া পুষ্টিমানও কমে যায়।

৭. চালের ভিটামিন পানির সাথে মিশে যায়, সেজন্য অনেকবার চাল ধোয়া এবং রান্নার পর ভাতের মাড় ফেলা উচিত নয়।

৮. রান্নার সময় খাদ্যদ্রব্য অধিক নাড়াচাড়া করা উচিত নয়।

৯. রান্না করার পূর্বে রন্ধনকারী আঁটসাঁটভাবে কাপড় পরবে। টাইট করে চুল বাঁধবে। এপ্রোন পরে রান্না করা সবচেয়ে ভালো অভ্যাস। শাড়ির আঁচল, ওড়না, চুলের ফিতা অগোছালো থাকলে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে।

১০. চুলা থেকে হাঁড়ি নামানোর সময় হাঁড়ি ধরার কাপড় ব্যবহার করা উচিত। ওড়না বা শাড়ির আঁচল দিয়ে কখনও হাঁড়ি নামানো উচিত নয়।

১১. তেলের কড়াইতে আগুন ধরে গেলে ঢাকনা দিতে হবে। কখনও পানি দিতে নেই।

১২. রান্না শেষ হলে চুলা নিভিয়ে রাখতে হবে।

খাদ্য পরিবেশন

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও গুছিয়ে খাদ্য পরিবেশনের ওপর খাওয়ার আগ্রহ ও তৃপ্তি নির্ভর করে। সুন্দর পরিবেশনের জন্য অনেক সাধারণ খাবারও মুখরোচক হয়ে ওঠে।

খাদ্য পরিবেশনের সময় লক্ষণীয় বিষয়

১. খাদ্য পরিবেশনের জায়গা ও পরিবেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি পরিষ্কারভাবে ধোয়া ও মোছা থাকবে।

২. মেনু অনুযায়ী খাদ্য পরিবেশনের নির্দিষ্ট সরঞ্জাম থাকবে। যেমন–ভাজির জন্য চেপ্টা প্লেট, ঝোলের তরকারি বা ডালের জন্য গর্তওয়ালা বাটি, পায়েস, দই ইত্যাদির জন্য ছোট বাটি ও চামচ ব্যবহার করতে হবে।

৩. টেবিলে খাদ্যদ্রব্য এমনভাবে রাখতে হবে যেন হাতের কাছে প্রয়োজনীয় খাবার পেতে অসুবিধা না হয়।

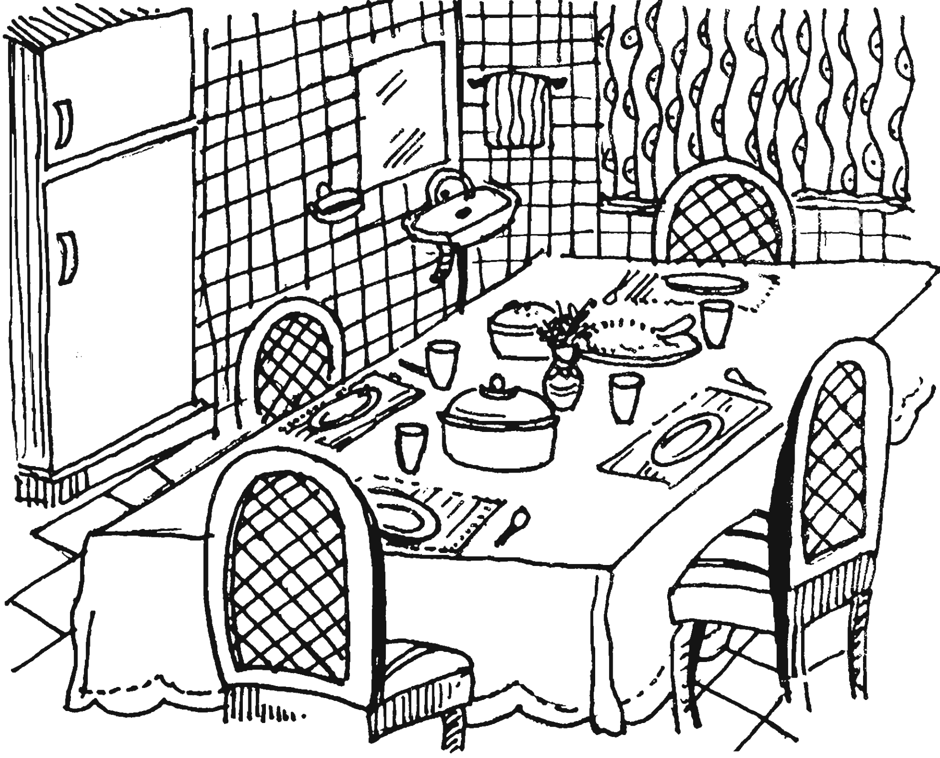
৪. খাবার টেবিলে পানির গ্লাস সম্পূর্ণ ভরে দেওয়া ঠিক নয়। এতে টেবিলে পানি পড়ে নোংরা হয়ে যায়। গ্লাসের ওপর প্রায় ২–৩ সে. মি. খালি রেখে পানি ঢালতে হয়।

৫. পরিবেশনকারিণী সবসময় বাম দিক দিয়ে খাদ্য পরিবেশন করবেন।

৬. খাবার টেবিলে নিচু আকৃতির ফুলদানি থাকবে। টেবিলে যারা খেতে বসবেন ফুলের আড়ালে যেন তাদের মুখ ঢাকা না পড়ে।

৭. খাওয়া শেষ হলে ট্রেতে করে সব সরঞ্জাম তুলে নিতে হবে।

৮. বুফে পদ্ধতিতে খাদ্য পরিবেশনে প্রয়োজনীয় গ্লাস, প্লেট, চামচ, ন্যাপকিন টেবিলের দুদিকে দেওয়া থাকবে। খাবারগুলো টেবিলের দুধারে রাখতে হবে যেন সহজেই নেওয়া যায়। লোকজন বেশি এবং জায়গা কম থাকলে বুফে পদ্ধতিই ভালো। কারণ এ পদ্ধতিতে বসার জন্য চেয়ারের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত লোকজন দাঁড়িয়ে খাবার খেয়ে থাকে। প্রয়োজনবোধে কয়েকটি চেয়ার ঘরের এক পাশে রাখা যেতে পারে।



টেবিলে খাদ্য পরিবেশনের সাধারণ নিয়ম

পানীয়

শরীরে পানির চাহিদা পূরণের জন্য আমরা বিশুদ্ধ সাদা পানি ছাড়াও শরবত, ডাবের পানি, ফলের রস ইত্যাদি তরল খাদ্য গ্রহণ করি। এগুলোই পানীয়। গরমের সময়, রোজার দিনে বা জ্বরে পড়লে পানীয় খুব উপকারী। নিচে কয়েকটি পানীয় প্রস্তুতের পদ্ধতি দেওয়া হল :

লেবুর শরবত

উপকরণ	পরিমাণ
কাগজি লেবুর রস	৩ টেবিল চামচ
ঠান্ডা পানি	৪ কাপ
চিনি	$\frac{৩}{৪}$ কাপ
বরফ কুচি	প্রয়োজনমতো

পদ্ধতি

১. লেবু ধুয়ে ফালি করে বিচি ফেলে দিতে হবে। হাত দিয়ে চিপে রস নিতে হবে।
২. লেবুর রসের সাথে পানি, চিনি মিশাতে হবে।
৩. মিহি কাপড়ে ছেঁকে রেফ্রিজারেটরে রেখে ঠান্ডা করে পান করতে হবে।
৪. বরফকুচি দিয়েও পরিবেশন করা যায়।

বেলের শরবত

উপকরণ	পরিমাণ
পাকা বেল	১টি
ঠান্ডা পানি	৩ কাপ
সিরাপ বা চিনি	১ কাপ
দুধ বা দই	আধাকাপ
গোলাপজল (ইচ্ছা)	১ টেবিল চামচ
বরফকুচি	প্রয়োজনমতো

পদ্ধতি

১. পাকা বেল মাঝে ফাটিয়ে চামচ দিয়ে শাঁস তুলে এক থেকে দেড় কাপ পানিতে ভিজাতে হবে।
২. বাঁশ অথবা তারের চালনি দিয়ে চেলে নিতে হবে।
৩. চালার পর বেলে অবশিষ্ট পানি ও ১ কাপ সিরাপ বা চিনি মিশাতে হবে। বেশি ঘন হলে পানি মিশানো যাবে।
৪. দই ফেটে নিতে হবে। দুধ বা ফেটানো দই মিশাতে হবে।
৫. গোলাপজল মিশিয়ে বরফ দিয়ে বেলের শরবত পরিবেশন করতে হবে। অনেকে দুধ ও গোলাপজল বাদ দিয়ে শুধু বেলের শরবত পছন্দ করেন।
৬. পরিবেশন হবে।

আমের শরবত

উপকরণ	পরিমাণ
কাঁচা আম	৪টি
সিরাপ বা চিনি	১ কাপ
ঠান্ডা পানি	৩ কাপ

লাল বা সবুজ রং (খাওয়ার) সামান্য

প্রস্তুত প্রণালী

১. কাঁচা আম খোসা ছাড়িয়ে স্লাইস করতে হবে। আম ছেঁচে রস করতে হবে। সবজি কুরুনি দিয়ে কুরিয়ে পানি মিশিয়ে চিপেও রস নেয়া যায়।
২. আমের রসের সাথে ৩ কাপ পানি ও ১ কাপ চিনি বা সিরাপ মিশিয়ে নিতে হবে।

৩. পরিবেশনের আগে সামান্য রং মিশাতে হবে।

৪. বরফ দিয়ে আমের শরবত পরিবেশন করতে হবে।

লাচ্ছি

<u>উপকরণ</u>	<u>পরিমাণ</u>
দই	১ কাপ
ঠান্ডা পানি	১ কাপ
সিরাপ/চিনি	২ টেবিল চামচ
বরফকুচি	প্রয়োজনমতো
লবণ	ইচ্ছা

পদ্ধতি

১. দই ফেটে ঠান্ডা পানি ও সিরাপ মিশাতে হবে।

২. মিষ্টি দই হলে সিরাপ বা চিনি কম দিতে হবে। বরফকুচি দিয়ে পরিবেশন করতে হবে। ইচ্ছে হলে সামান্য লবণ মিশানো যায়।

৩. ২ জনকে পরিবেশন করা যাবে।

নাশতা

সাধারণত সকালে, কখনও বিকালে নাশতার ব্যবস্থা থাকে। বাড়িতে মেহমান আসলেও নাশতা তৈরি করা হয়। নাশতায় অনেক সময় ভারী খাবারের ব্যবস্থা থাকে। আবার হালকা নানা ধরনের খাবারও নাশতার জন্য সমাদৃত হয়। নিম্নে কয়েকটি নাশতার রেসিপি দেওয়া হল :

ডিমের স্যান্ডউইচ

<u>উপকরণ</u>	<u>পরিমাণ</u>
ডিম সিদ্ধ	৩টি
মাখন বা মেয়নেজ	$\frac{১}{৩}$ কাপ
লবণ	$\frac{৩}{৪}$ কাপ
গোলমরিচ গুঁড়া	$\frac{১}{৪}$ চা চামচ
পাউরুটি	১ পাউন্ড
টমেটো	১টি
শসা/খিরা	১টি

পদ্ধতি

১. সবজি কুরুনিতে সিদ্ধ ডিম ঝুরি করে নিতে হবে।
২. শসা চিকন করে কেটে নিতে হবে নতুবা কুরুনি দিয়ে কুচি করে নিতে হবে।
৩. টমেটো পাতলা করে কেটে নিতে হবে।
৪. পাউরুটি ও টমেটো ছাড়া সব উপকরণ এক সাথে মিশাতে হবে।
৫. দুই স্লাইস পাউরুটিতে মেয়নেজ মাখতে হবে। এক স্লাইস পাউরুটির ওপর ডিমের উপকরণ ছুরি দিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। ওপরে টমেটোর পাতলা স্লাইস বিছিয়ে দিয়ে অন্য স্লাইস পাউরুটি দিয়ে ঢেকে হাতের তালু দিয়ে চেপে দিতে হবে।
৬. ছুরি দিয়ে চারপাশ সমান করে কেটে নিতে হবে। মাঝখানে বা কোনাকুনি করে কেটে স্যান্ডউইচের আকৃতি করে নিতে হবে।
৭. প্রায় ১০ টুকরা স্যান্ডউইচ হবে এক পাউন্ড পাউরুটি দিয়ে। পরিবেশন হবে।

আলুর চিপস

<u>উপকরণ</u>	<u>পরিমাণ</u>
আলু	আধা কেজি
গুঁড়া লবণ	আধা চা চামচ
সয়াবিন তেল	দেড় কাপ

পদ্ধতি

১. আলুর খোসা ছাড়িয়ে চিপস কাটা মেশিনে কেটে নিতে হবে। মেশিন না থাকলে ধারালো বঁটি দিয়ে পাতলা স্লাইস করে কাটতে হবে।
২. পানিতে লবণ গুলে ১৫–২০ মিনিট কাটা আলু ভিজাতে হবে।
৩. পানি থেকে ছেঁকে তুলে ট্রেতে বা অন্য কোনো ডিশে বাতাসে ছড়িয়ে দিতে হবে।
৪. পানি ঝরে শুষ্ক হয়ে আসলে কড়াইতে তেল গরম করতে হবে।
৫. তেলের তাপ পরীক্ষা করার জন্য প্রথমে ২–১ টুকরা আলু ছেড়ে দেখতে হবে। বুদবুদ উঠলে আলু ভাজি ভালো হবে।
৬. তেলে আলু ছেড়ে মচমচে ভাজা হলে ঝাঁঝরি চামচ দিয়ে তুলে, তেল শুষে নেয় এমন কাগজে তুলে রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সামান্য লবণ ছিটিয়ে দিতে হবে।
৭. ৩ জনকে পরিবেশন করা যাবে।

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই

<u>উপকরণ</u>	<u>পরিমাণ</u>
আলু	আধা কেজি
লবণ	আধা চা চামচ
তেল	দেড় কাপ

পদ্ধতি

১. আলুর খোসা ছাড়িয়ে বড় আকৃতির আলু আঙুলের মতো মোটা ফালি করে কাটতে হবে।
২. কাটার পর লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে।
৩. ১০–১৫ মিনিট পর পানি থেকে তুলে বাতাসে ছড়িয়ে পানি শুকাতে হবে। প্রয়োজন হলে কাপড় চিপে পানি শুকানো যায়।
৪. ডুবো তেলে হালকা বাদামি রং করে ভেজে কাগজে রাখতে হবে তেল শুষে নেওয়ার জন্য।
৫. সস দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করা যায়।
৬. ৩ জনকে পরিবেশন করা যাবে।

সালাদ

ফল ও সবজির সালাদ

টাটকা ফল ও সবজির সালাদ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। পোলাও কোর্মা, রেজালা অথবা বিরিয়ানির সাথে টেবিলে সালাদের ডিশ খাওয়ার প্রতি রুচি বাড়ায়। খাদ্যে বৈচিত্র্য আনে। তাছাড়া রঙিন সবজি ও ফলমিশ্রিত সালাদ টেবিলের সৌন্দর্য বাড়ায়। সালাদে কাঁচা টক জাতীয় ফল ও সবজি থাকে, সেজন্য ভিটামিন সি ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান পাওয়া যায়। খোসা ছাড়ানোর পর অনেক ফল ও সবজি বাতাসের সংস্পর্শে কালো হয়ে যায়। লবণ পানি, লেবুর রস বা চিনির সিরাপ মাখিয়ে রাখলে কালচে হয় না।

যেসব সবজি ও ফল দিয়ে সালাদ তৈরি করা যায়

সবজি	ফল
শসা, খিরা, টমেটো, গাজর, বীট, মুলা, বাঁধাকপি, লেটুস, ধনেপাতা, পুদিনাপাতা, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, ইত্যাদি।	বাতাবিলেবু, আমড়া, কামরাঙা, আপেল, কমলা, বেদানা, ডালিম, পেঁপে, পাকা আম, কলা, লেবু, আনারস, পাকা পেয়ারা ইত্যাদি।

পাকা ফলের সালাদ

উপকরণ	পরিমাণ	উপকরণ	পরিমাণ
কলা	৪টি	জামবুরা ছাড়ানো	১টি
পেঁপে	অর্ধেক	লেবু	১টি
পেয়ারা	২টি	চিনি	২ টেবিল চামচ
আমড়া	২টি	গোলমরিচের গুঁড়া	আধা চা চামচ
আপেল	১টি		

পদ্ধতি

১. কলা, পেঁপে, পেয়ারা, আপেল ছোট স্লাইস করে লেবুর রস মাখিয়ে রাখতে হবে।
২. আমড়াও স্লাইস করে নিতে হবে।
৩. সব ফল, গোলমরিচ গুঁড়া, চিনি, লবণ ও লেবুর রস দিয়ে মাখিয়ে রেফ্রিজারেটরে রাখতে হবে। খাওয়ার সময় বের করে নিতে হবে।
৪. আট জনকে পরিবেশন করা যাবে।

সবজির সালাদ

উপকরণ	পরিমাণ	উপকরণ	পরিমাণ
খিরা	৪টি	কাঁচামরিচ	৪টি
গাজর	২টি	লেবু	১টি
টমেটো	৬টি	লবণ	১ চা চামচ
লেটুসপাতা	৩টি	ধনেপাতা কুচি	২ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ	৪টি		

পদ্ধতি

১. সব সবজি ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে স্লাইস করে বা ছোট টুকরা করে কাটতে হবে। লেটুস পাতা শুধু ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।
২. পেঁয়াজ গোল করে কাটতে হবে, কাঁচামরিচ ও ধনেপাতা কুচি করতে হবে।
৩. প্লেটে লেটুসপাতা বিছাতে হবে। স্লাইস ও টুকরা করা সবজিতে লবণ মাখিয়ে পাতার ওপর রাখতে হবে।
৪. কাটা পেঁয়াজ, কুঁচিকরা ধনেপাতা, কাঁচামরিচ সবজির ওপরে ছিটিয়ে দিতে হবে।
৫. ১০–১২ জনকে পরিবেশন করা যাবে।

পোশাক প্রস্তুতকরণ ও এমব্রয়ডারি

নবজাতক শিশুর একছাঁটের জামা তৈরি

নবজাতক শিশুর জামা সাধারণত একছাঁটের হওয়া আবশ্যক। জামা নরম সুতি কাপড়ের ও ঢিলেঢালা হলে শিশু জামা পরে আরাম পাবে। এই জামার কাপড় সুতি, মলমল, তাঁত, ভয়েলের তৈরি এক রঙের অথবা, ছোট ছাপার হলে ভালো। নিম্নে নবজাতক শিশুর একছাঁটের জামার ড্রাফটিং ও সেলাইয়ের নিয়ম বর্ণনা করা হল—

জামা তৈরির প্রয়োজনীয় সামগ্রী

কাপড় ৩৫ সে. মি. পেন্সিল, রবার, গজফিতা, স্কেল, শেইপ কাঠ, পিন, সুচ, কাঁচি, সুতা, সেলাই মেশিন ইত্যাদি।

একছাঁটের ফ্রক তৈরি করার জন্য বাদামি কাগজের প্রয়োজন নেই। মাপ নিয়ে সরাসরি কাপড়ের ওপর ছাঁটা যাবে। যেমন–

মাপ– চওড়া = ৬৫ সে. মি.

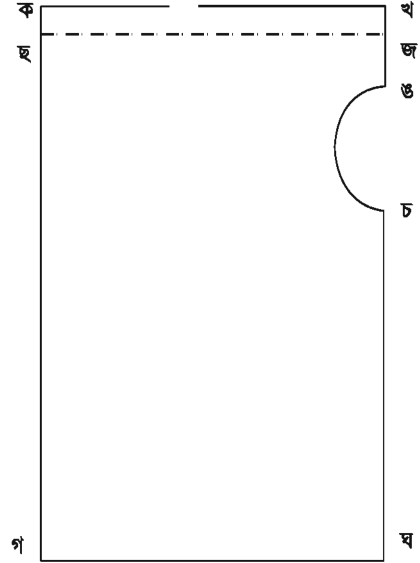
লম্বা = ৩৫ সে. মি.

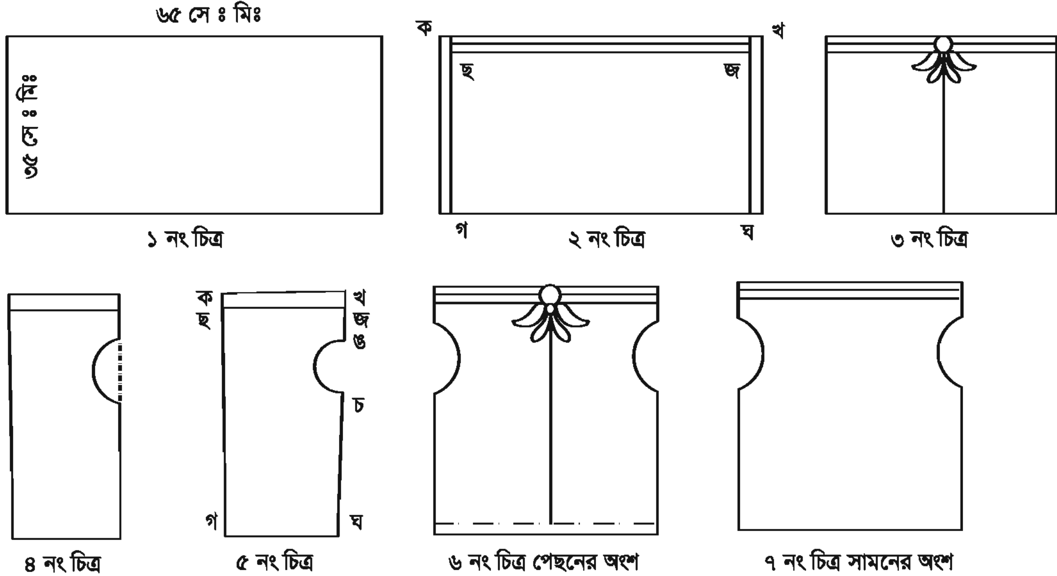
চিত্র কখ = ঘের এর চওড়ার $\frac{১}{৪}$

কগ = লম্বার মাপ

গঘ = কখ এবং কগ = খঘ

ঙট = হাতের বগল





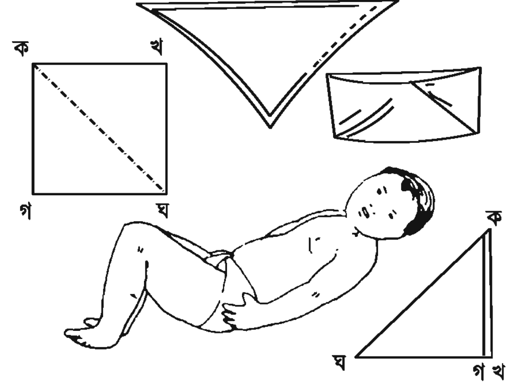
জামা তৈরির বিভিন্ন ধাপ

খ থেকে ৭ সে. মি. নিচে ঙ. চিহ্নিত করতে হবে। ৬ থেকে ৭ সে. মি. নিচে চ চিহ্নিত করে ঙচ বাঁকা রেখার সাহায্যে বগলের আকৃতি করে কেটে নিতে হবে।

প্রথম ঘেরের দুই ধার সেলাই করে নিতে হবে। হাতের বগলে পাইপিং লাগাতে হবে। কছ এবং খজ রেখা ২ সে. মি. ভাঁজ করে পুরাটুকু হেম বা মেশিনে সেলাই করতে হবে। এই ভাঁজের ভিতর লম্বা ফিতা ভরতে হবে। ঝুলের নিচের অংশে ২.৫ সে. মি. ভাঁজ করে (বর্ডার) হেম করতে হবে। নবজাতক শিশুকে জামা পরিয়ে পিছনে ওপরের দিকে ফিতা টেনে হালকা গিঁট দিয়ে বো করে দিলে পুরা গলার চারদিকে কুঁচি পড়বে।

শিশুর ন্যাপি তৈরি

নবজাতক শিশুদের সাধারণত জাঙ্গিয়ার বদলে ন্যাপি পরানো হয়। এই ন্যাপি পরাতে এবং বদলাতে খুব সুবিধা। এই ন্যাপি তৈরি করতে হলে ৩৫ সে. মি. মাপের একটি বর্গাকৃতি কাপড়কে কোনাকুনি দুই ভাঁজ করতে হবে। তারপর চারদিকে একটু চওড়া করে পাইপিং দিয়ে সেলাই করতে হবে। চিত্রে খ চিহ্নিত স্থানে একটি লুপ তৈরি করে সেলাই করে ন্যাপিতে আটকে দিতে হবে। ন্যাপি পরানোর পর খ কোনার লুপ দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে পেটের কাছে এনে ক কোনা খ লুপের ভিতরে দিতে হবে। কঘ এক সাথে গিঁট দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।



শিশুসহ ন্যাপি

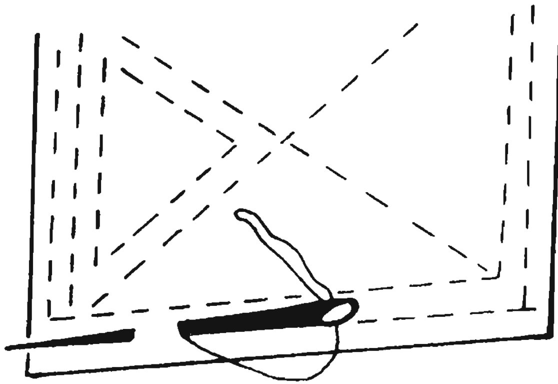
এমব্রয়ডারি

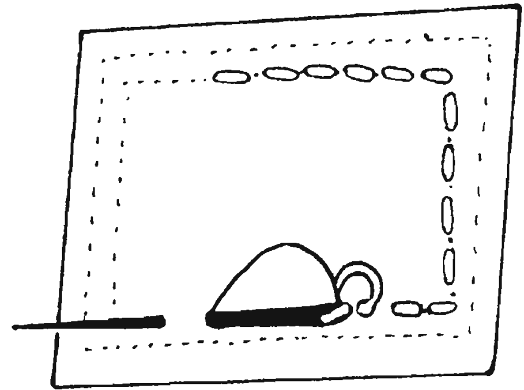
আমরা দৈনন্দিন জীবনে অহরহ বিভিন্ন সেলাইয়ের কাজ করে থাকি। এই সেলাই বিভিন্ন ফোঁড় বা স্টিচের সাহায্যে করা হয়। সঠিক ফোঁড় ব্যবহারে একটি ডিজাইনের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায়। বিভিন্ন ফোঁড় ব্যবহার করে জামা, শাড়ি, টেবিল ক্লথ, ট্রে ক্লথ, বালিশের কভার ইত্যাদিতে নকশা করা হয়। এমব্রয়ডারি করতে হলে সুচ, বিভিন্ন রঙের সুতা ও ফ্রেমের প্রয়োজন হয়।

নিম্নে বিভিন্ন ফোঁড় শেখার পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করা হল

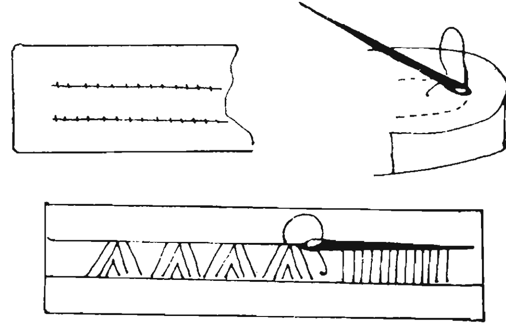
রান ফোঁড়– হাতে সেলাইয়ের ফোঁড়গুলোর মধ্যে এই ফোঁড় সবচেয়ে সহজ। কাপড়ের ওপর নিচ দিয়ে সুচ সমানভাবে প্রবেশ করিয়ে টানা সেলাই দিতে হয়। এই ফোঁড়ের মাধ্যমে আমাদের বহুল প্রচলিত কাঁথা তৈরি হয়ে থাকে।

টাক– রান ফোঁড়ের সাহায্যে কোনো পোশাক তৈরি করার সময় অস্থায়ীভাবে যে সেলাই করা হয় তাকে টাক সেলাই বলে। যেমন দুই কাপড় একসাথে জোড়া দিতে বা প্লিট দিতে টাক সেলাই ব্যবহার করা হয়।


রান ফোঁড়

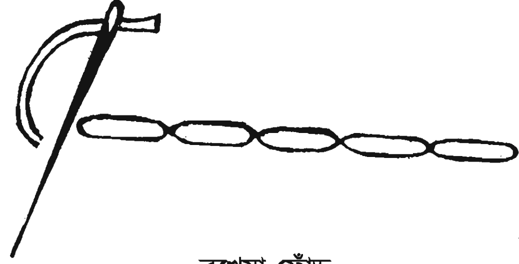

টাক সেলাই

হেম– সুচ সুতা দিয়ে কাপড়ের শেষ প্রান্ত থেকে কয়েকটা সুতা নিয়ে ফোঁড় তুলে অন্য প্রান্তের যে জায়গার সাথে মিশবে ঐ জায়গায় আর একটি ফোঁড় তুলে সুচ সুতা টেনে হেম করা হয়। গলায়, হাতের মুড়িতে, জামা ও ব্লাউজের নিচে ট্রে ক্লথ, টেবিল ক্লথ ও রুমালের কিনারায় এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। কাপড়ের উল্টা দিকে হেম সেলাই করা হয়।



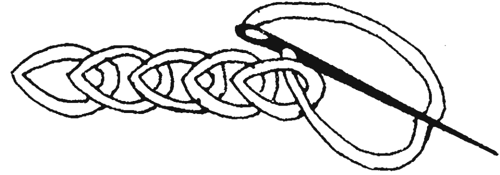
হেম ফোঁড়

বখেয়া–সুতার মাথায় গিঁট দিয়ে উল্টা দিক থেকে সুচ সোজা দিকে তুলে নিতে হয়। এই ফোঁড়ের পিছন দিকে সুচ ঢুকিয়ে আগের সেলাইয়ের সামনের দিকে সুচের মাথা বের করতে হয়। এভাবে পিছন দিক থেকে আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগোতে হবে। কাপড়ের সোজা অংশে মেশিনের সেলাইয়ের মতো হবে। এই ফোঁড়ের সেলাই খুব মজবুত হয়। কোনো কাপড়ের দুই অংশ জোড়া দিতে, জামা, প্যান্ট ইত্যাদির চেন লাগাতে এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়।



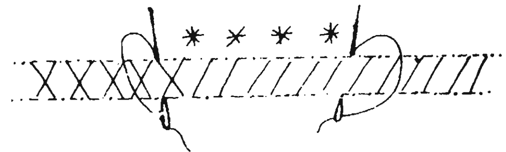
বখেয়া ফোঁড়

চেন–সুতার গোড়া থেকে সুচ সামনে তুলে সুচের মাথার ওপর দিয়ে সুতা ঘুরিয়ে সুচ টান দিতে হয়। পরের ফোঁড়গুলো পূর্বের ফোঁড়ের মতো সুতার ভিতর থেকে সুচের ওপর সুতা পেঁচিয়ে তুলতে হয়। এই ফোঁড় চেইনের মতো দেখতে বলে একে চেন ফোঁড় বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার নকশার ডালে এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়।



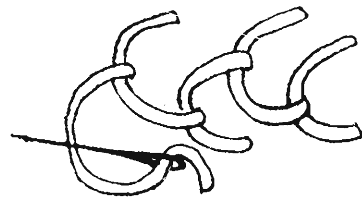
চেইন ফোঁড়

ক্রসস্টিচ– কাপড়ের উপর দুই লাইনের মধ্য দিয়ে বাম থেকে ডান দিকে তেরছা করে সুচ সুতাকে এগিয়ে আনতে হবে। পরবর্তী সময় ডান দিক থেকে একই লাইনে বাম দিকে তেরছাভাবে সুচের ফোঁড় তুলতে হবে। এভাবে ক্রস ফোঁড় দেওয়া হয়। চট, সেলুলার কাপড়, জায়নামাজ, ব্যাগ, চালনি, কুশন কভার ইত্যাদিতে এই ফোঁড় ব্যবহার করে নকশা তৈরি করা হয়।



ক্রসস্টিচ

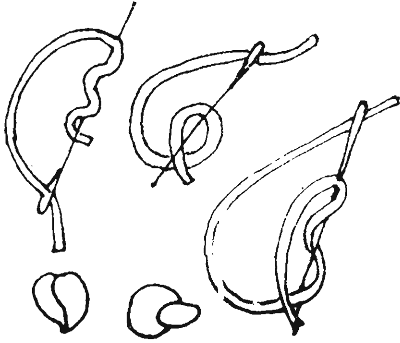
ফেদারস্টিচ– এই ফোঁড়ে সাধারণত ফোঁড়গুলো ডান এবং বাম দিকে সুচ সামান্য বাঁকা করে সুঁচের মাথার সামনে দিয়ে সুতা ঘুরিয়ে করা হয়। পাখির পালকের মতো একটার পর একটা সাজানো থাকে বলে একে পালক ফোঁড় বা ফেদারস্টিচ বলা হয়। এই ফোঁড় বোতাম ফোঁড়ের মতো।

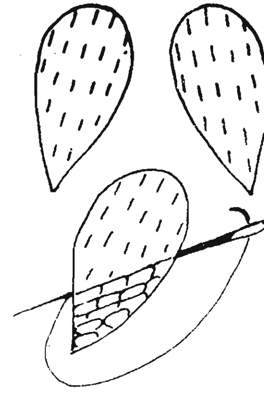


ফেদার স্টিচ

নটস্টিচ– কাপড়ের উল্টা দিক থেকে সুচের অর্ধেক কাপড়ের সোজা দিকে তুলে সুচের মাথায় তিন চার বার সুতা পেঁচাতে হবে। সুচ টেনে ডান হাতের আঙুল দিয়ে পেঁচান সুতাকে সুচের একদিকে জমিয়ে সুতার ভিতর দিয়ে শক্ত করে আগের ফোঁড়ের কাছ দিয়ে নিচের দিকে টেনে আনতে হবে। দেখতে নট বা গিঁটের মতো।

ভরাট ফোঁড়– প্রথমে নকশার জায়গায় রান ফোঁড় দিতে হবে। তারপর বাঁকাভাবে কাপড়ের ওপরে ও নিচে সুচ দিয়ে সুতা ঘুরিয়ে ঘনঘন ফোঁড় তুলে নকশার জায়গাটা সুন্দর করে ভরাট করতে হবে। বাচ্চাদের ফ্রক, রুমাল, টেবিল ক্লথ, শাড়ি ইত্যাদিতে এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়।

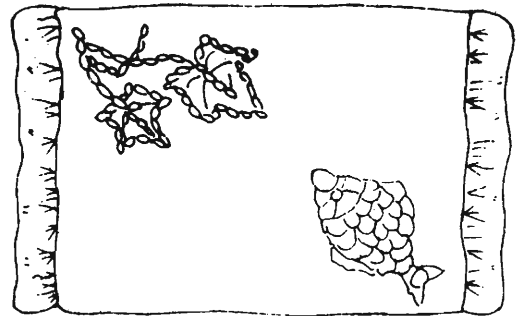

নটস্টিচ


ভরাট ফোঁড়

এমব্রয়ডারি সেলাই দ্বারা বালিশের কভার/ট্রে ক্লথে লোকজ মোটিফের নকশা

বালিশের কভার বা ট্রে ক্লথ এক রঙের কাপড় দিয়ে করা যায়। তবে এগুলোকে আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন রঙের সুতা দিয়ে বিভিন্ন নকশার সেলাই করা যায়।

সাধারণত আমাদের দেশে মাছ, পাখি, ফুল, পাতা ইত্যাদির নকশা ব্যবহার করে বিভিন্ন ফোঁড়ের মাধ্যমে ট্রে ক্লথ ও বালিশের কভার সেলাই করার প্রচলন দেখা যায়। এভাবে নকশা এক কোনায় বা মাঝখানেও করা যায়।


রান ফোঁড়

এই নকশাটি বালিশের কভার অথবা, ট্রে ক্লথের কোনায় এঁকে নিতে হবে। পছন্দ অনুযায়ী সুতা ব্যবহার করে চেইন ফোঁড় ও ডাল ফোঁড় দিয়ে করা হয়। ইচ্ছা করলে রান ফোঁড় দিয়ে নকশীকাঁথার মতো ভরাট করা যেতে পারে।

উল বুনন

শীতকালে নানারকম উলের পোশাক পরা হয়। এর মধ্যে অনেকগুলো যেমন টুপি, মোজা, মাফলার, সোয়েটার ইত্যাদি ঘরেই হাতে বোনা যায়। এখানে মোজা ও উল্টো সেলাই দিয়ে উলের মাফলার তৈরির পদ্ধতির বর্ণনা করা হল—

মাফলার বুনা

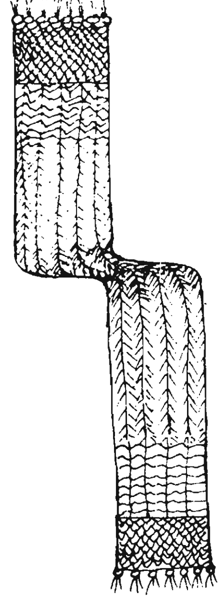
প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ঃ ৯নং উলের কাঁটা ১ জোড়া, ৪ প্লাই এক রঙের উল ৩৫ গ্রাম এবং মাপার ফিতা।

বুনন পদ্ধতি

প্রথমে কাঁটায় ৪০ ঘর তুলতে হবে। এক ঘর সোজা এক ঘর উল্টা এভাবে বুনতে হবে। সোজা বুনার সময় কাটা ঘরের পিছন দিকে ঢুকিয়ে সোজা বুনতে হবে।

২য় কাঁটা বুনার শুরুতে প্রথম ঘরের পিছনে কাঁটা ঢুকিয়ে ঘরটি ডান হাতের কাঁটায় তুলে নিতে হবে। এবার সামনে সুতা এনে ১ ঘর উল্টা বুনতে হবে। তারপর ১ ঘর সোজা ১ ঘর উল্টা বুনে লাইন শেষ করতে হবে। প্রত্যেক লাইনের শুরুতে প্রথম ঘর না বুনে পিছনে কাঁটা ঢুকিয়ে ঘর তুলে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে সোজা বুনার সময় ঘরের পিছন দিকে কাঁটা ঢুকাতে হবে। এভাবে বুনে ৭০ সে. মি. লম্বা হলে ঘর বন্ধ করতে হবে। এবার ১৬ সে. মি. লম্বা ১৪ টুকরা উল নিতে হবে।

এক টুকরা উল ২ ভাঁজ করে মাফলারের ১ কোনায় ঢুকাতে হবে। উলের দুই মুখ সমান রেখে গিঁট দিয়ে ঝালর করতে হবে। মাফলারের দুই প্রান্তে সমান দূরত্বে ৭টি করে ঝালর হবে।


মাফলার

ক্রুসের কাজ–লং চেন দ্বারা গ্লাসের ঢাকনা তৈরি

প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

১১ নম্বর ক্রুস কাঁটা ১টি

ক্রচেট সুতা ১ গুটি

মটর আকারের ও সুতার রঙের পুঁতি ২০টি।

তৈরি পদ্ধতি

১ম লাইন : প্রথমে ১০ চেন করে গোল করে নিতে হবে।

২য় লাইন : গোলের চারদিকে ঘন ১ লাইন লং (১৮টি লং) বুনতে হবে।

৩য় লাইন : চেন ও লং করে মোট ৮ বার বোনার পর ৭টি ছিদ্র হবে।

৪র্থ লাইন : ৫ চেন ও প্রত্যেক ছিদ্রের মধ্যে ৩ লং করতে হবে। এরপর ৪টি চেন করে লাইন শেষ করতে হবে।

৫ম লাইন : ঘন ১ লাইন লং বুনতে হবে।

৬ষ্ঠ লাইন : ২ চেন ৩ লং করে লাইন শেষ করতে হবে।

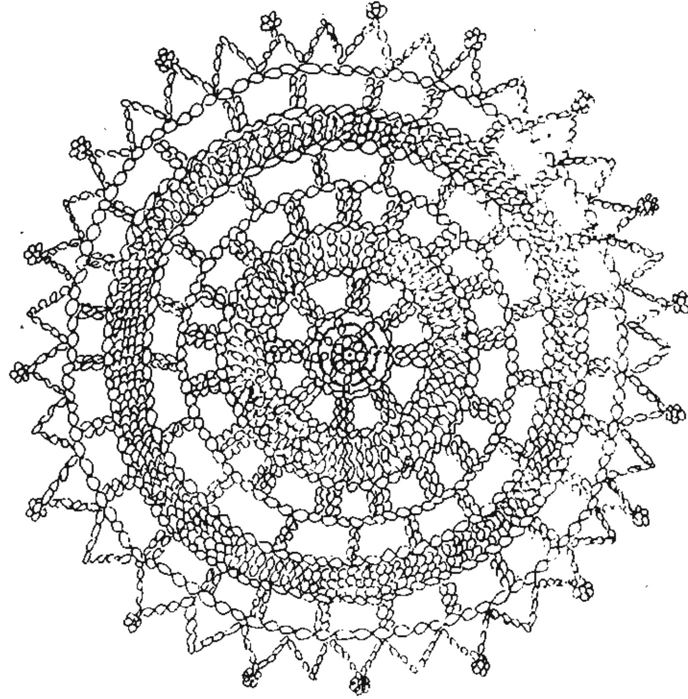
৭ম লাইন : ৪ চেন এবং প্রত্যেক ছিদ্রের মধ্যে ২ লং করে বুনতে হবে।

৮ম লাইন : ঘন ১ লাইন লং বুনতে হবে।

৯ম লাইন : ৩ চেন ২ লং করে বুনতে হবে।

১০ম লাইন : কিনারে ১০ চেন করে প্রত্যেক ছিদ্রের মধ্যে হাফ লং দিয়ে আটকে দিতে হবে। এভাবে চারদিকে ঝালরের মতো বুনে যেতে হবে। এক ঝালর বাদ দিয়ে পুঁতি লাগাতে হবে।

ঢাকনার মাপ ঝলরসহ ১৩.৫ সে. মি. ব্যাসের হবে।



গ্লাসের ঢাকনা

ষষ্ঠ অধ্যায়

ছাগল পালন

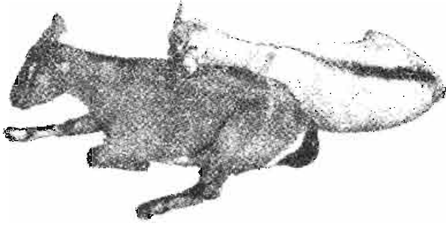
আমাদের দেশের গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছাগল অন্যতম। এ দেশে গ্রামে প্রায় পরিবারই ছাগল পালন করে থাকে। ছাগল শান্তশিষ্ট উপকারী প্রাণী। ছাগল ছোট প্রাণী। ছোট খামার এবং বসতবাড়িতে অল্প খরচে এদের পালন করা যায়। আমাদের দেশে ২ ধরনের ছাগল পাওয়া যায়।

যেমন–

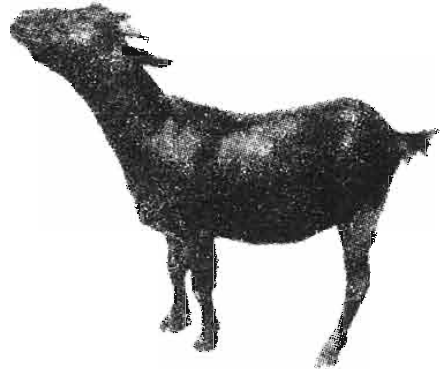
১। দেশি জাতের ছাগল

২। বিদেশি জাতের ছাগল

দেশি জাতের ছাগল



চিত্র : ছাগল গৃহপালিত শান্তশিষ্ট প্রাণী



চিত্র : ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল

দেশি জাতের ছাগলের মধ্যে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল বিশ্ববিখ্যাত। বাংলাদেশে বেঙ্গল জাতের ছাগলের মধ্যে কালো ছাগলের সংখ্যাই বেশি। এজন্য একে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বলে। তবে মিশ্রভাবে সাদা ও বাদামি রঙের ছাগল আমাদের দেশে রয়েছে। এই ছাগলের মাংস ও চামড়া উন্নত মানের হয়। বিদেশে আমাদের দেশের ছাগলের চামড়ার চাহিদা বেশি। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের দুধ খুবই সুস্বাদু ও মাংস আমিষ সমৃদ্ধ।



চিত্র : যমুনাপাড়ি ছাগল

বিদেশি জাতের ছাগল

আমাদের দেশে বিদেশি জাতের ছাগলও পাওয়া যায়। বিদেশি জাতের মধ্যে যমুনাপাড়ি ছাগল উল্লেখযোগ্য। এ জাতের ছাগলের উৎপত্তি ভারতে। এরা রামছাগল নামে পরিচিত। এরা আকারে বড় হয়। পা ও কান লম্বা। কান ঝুলানো থাকে। এসব জাতের ছাগলের রং প্রধানত বাদামি–ধূসর। এরা বেশি দুধ দেয়।

ছাগল থেকে আয়

ছাগল পালন করে আমরা পরিবারের আয় বাড়াতে পারি। পরিবারের আয় বাড়লে সচ্ছলতা বাড়ে। কৃষক পরিবারের দুঃখ কষ্ট দূর হয়। ছাগল পালনে মহিলারা বেশি কাজ করে থাকে। এজন্য গ্রামীণ গরিব মহিলাদের জন্য ছাগল পালন একটি আয়মূলক কর্মসংস্থান হতে পারে। এসব কারণে বাংলদেশে ছাগল পালন খুবই উপকারী।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে কয় ধরনের ছাগল পাওয়া যায়?

ক. ১ খ. ২

গ. ৩ ঘ. ৪

২. ছাগল পালন করলে কী হয়?

ক. আয় বাড়ে খ. ব্যয় বাড়ে

গ. পরিবেশ নষ্ট হয় ঘ. রোগ সংক্রামিত হয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন

করিম একজন বেকার যুবক। তার সংসারে অভাব অনটন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী করিম পরিবারের অভাব মোচনের জন্য ছাগল পালনের সিদ্ধান্ত নেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্ল্যাক বেঙ্গাল প্রজাতির ছাগল পালন শুরু করেন।

ক. আমাদের দেশে কত ধরনের ছাগল পাওয়া যায়?

খ. করিমের ব্ল্যাক বেঙ্গাল পালন সুবিধাজনক মনে হয়েছে কেন?

গ. ছাগল পালন কীভাবে করিমের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করতে পারে লিখ।

ঘ. ব্ল্যাক বেঙ্গাল ও যমুনাপাড়ি ছাগলের পার্থক্য আলোচনা কর।